পরকীয়া

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

শ্যামবাজার পুস্তকালয়
১৩১ সি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, (শ্যামবাজার)
কলিকাতা

গতানুগতিক-পন্থাবর্জ্জিত

সম্পূর্ণ বাস্তববাদী উপন্যাস

অগ্রজ-প্রতিম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু—

উঠান হইতে ঘরের মধ্যে দৃষ্টি পড়িতেই ফুলীর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল! জলভরা মাটীর কলসীটা আর একটু হইলেই তাহার কাঁখ হইতে পড়িয়া ভাঙিয়া চুর্‌মার্‌ হইয়া যাইত। অনেক কষ্টে সে তাহা সাম্‌লাইয়া লইল। পা দুইটা কিন্তু তাহার তখনো থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল!

ও-দিকে লখী শশব্যস্তে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া যথাসম্ভব সপ্রতিভভাবেই প্রশ্ন করিল,—কি-লো ফুলী, জলকে গেইছিলি না-কি?

একে ত ফুলীর অন্তর তখন দারুণ উত্তেজনায় গুর্‌গুর্‌ করিতেছে,—তাহার উপর লখীর প্রশ্নে তাহার মাথায় যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল! মুখখানা বাঁকাইয়া তীব্র ঝাঁজের সহিত সে উত্তর দিল,—তুখে আর সাউখুড়ী মারাতে হবেক নাই লখী! কুথা যে গেইছিলম, তা' আবার তুই জানিস্‌ না?—খুব জানিস্‌!

মুখের উপর জবাব পাইয়া লখী প্রথমটা একটু দমিয়া গেল; কিন্তু পরক্ষণেই নিজের দুর্ব্বলতায় যেন নিজেই ধাক্কা খাইয়া সে-ও ঝাঁজাল সুরে বলিয়া উঠিল, 'জানি ত জানি! তুই আমার কি ক'রে লিবি লে!'—পরে ঘরের দিকে চাহিয়া বলিল—'চল্‌লম্‌ রে নফরা, কাল্‌কে একবার আমাদের ঘর পানে তুই যাস্‌।'

আর মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া স-গর্ব্বে জোরে জোরে

পা ফেলিয়া লখী চলিয়া গেল। যাইবার সময় ফুলীর মুখের উপর একটা অগ্নিবর্ষী ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করিতেও ছাড়িল না।

উত্তেজনার প্রাবল্যে ফুলী তখন যেন বাক্‌শক্তিও হারাইয়া ফেলিয়াছে! তাহার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিতেছে! এতবড় স্পর্দ্ধা, তাহারই ঘরে আসিয়া তাহারই উপর চোখ রাঙাইয়া যায়!

ইত্যবসরে নফরাও ঘরের বাহিরে আসিল; ফুলীর দিকে একটু অগ্রসর হইয়া, যেন কিছুই হয় নাই,—এমনি ভাবেই সে বলিল,—ওই, অমন ক'রে উঠোনে দাঁড়ায়ে আছিস্ কেনে? ঘরকে আয়? দেখ্‌ছিস্ নাই, সাঁজ হ'য়ে গেল; আবার রাঁধ্‌বি বাড়্‌বি কখন?

ফুলীর মুখখানা এইবার পাথরের মতই কঠিন হইয়া উঠিল! কোন কিছু উত্তর না দিয়া, দুপ্ দুপ্ পা ফেলিয়া সে ঘরের মধ্যে ঢুকিল এবং একটা খড়ের বিঁড়ির উপর জলের কলসীটা নামাইয়া রাখিয়াই আবার বাহিরে আসিল; তারপর দুই হাত দিয়া হাঁটু দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া মাথাটা নীচু করিয়া উঠানেই বসিয়া রহিল।

মনে মনে নফরা তখন একটু ভয়ই পাইয়াছে। কিন্তু বাহিরে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া যথাসম্ভব সহজভাবেই সে বলিল,—কি হ'লো কি তুর? চুপ ক'রে ব'সে রইলি যে বড়! সেই কখন চাট্টি পান্তভাতে-মুড়িতে খেয়ে কাজে গেইছি, তুর মনে নাই?

ফুলী যেন আর উত্তেজনা চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। স্বামীর মুখের দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ বিমুখ হইয়া সে উত্তর করিল,—আমার আর মনে নাই-বা থাক্‌লো রে খাল্‌ভরা! ইবার থেকে লখী এসে তুর ঘর কর্‌বেক্‌। তুর ভাত রেঁধে দিবেক। আমি তুর কে?

নফরা কিন্তু ফুলীর কথা গায়ে মাখিল না; বরঞ্চ ফুলীকে প্রীত করিবার উদ্দেশ্যেই ঈষৎ হাসিয়া সুর করিয়া বলিল,—

তুই যে আমার পেরাণ-সখি,
বাঁচ্‌তে লারি সই লো আমি—
তুরে না দেখি!

সহসা ফুলী গর্জ্জিয়া উঠিল,—যা, যা, আর ফচ্‌কেগিরি করিস্‌ না। তুর যত গুণ, তা আর আমার জান্‌তে বাকী নাই! উ-সব গায়েন লখীর কাছে গাইবি; লখী তুর গায়ে ঢলে পড়্‌বেক! আমি কালই বাপের কাছে চলে যাব।'—

শেষের দিকে একটা দারুণ ঘৃণা ও অভিমানের ভাব তাহার মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিল!

নফরা যখন দেখিল, কাজ নরমে হইবার নয়; তখন সে নিজেকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার জন্য সহসা গরম হইয়া উঠিল!—"আচ্ছা, তুই যে ভারী 'লখী লখী' করছিস্‌"—স্বরে একটু রুক্ষতা আনিয়াই সে বলিল,—"লখী তুর কি কর্‌লেক বল্‌ ত?"

'আমার আবার কি কর্‌বেক রে,'—পূর্ব্বের মত ঝাঁজের সহিতই ফুলী উত্তর দিল,—'তুর মু'য়ে পিণ্ডি দিলেক্ ! দেখিস্, এত পীরিত শেষতক্ থাক্‌লে হয় ! বাউরী-ঘরে জম্মে এই বয়েসে অমন অনেক দেখ্‌লম রে, অনেক দেখ্‌লম !'

নফরা এবার গলার স্বর এক পর্দ্দা চড়াইয়া দিল,—'ছাখ্ ফুলী, খামকা-খামকা লোককে দোষ দিস্‌না বল্‌ছি ; ভাল হবেক নাই ! 'টাঠ্‌ুয্যেদের' মাঠে লখী আজ আমার সঙ্গে কাজ করেছিল, বুঝ্‌লি ? তাই খাটালীর পয়সার ভাগ লিতে এসে দু'ডণ্ড আমার কাছে বসেছিল।

'হুঁ, বসেছিল !'—মুখ ভেঙাইয়া বিদ্রূপের স্বরেই ফুলী বলিয়া উঠিল,—'একেবারে গলা ধরাধরি করে,—মু'য়ের উপর মু' দিয়ে ! নইলে আর পয়সা চাইবেক্ কি ক'রে ! আমি বুঝি কাণা, কিছু দেখ্‌তে পাইনাই !'

'ছাই পেয়েছিস্ !'—নফরাও সমান ওজনে উত্তর দিল,—'তুর লিজের মন খারাপ, তাই লোককে খারাপ দেখ্‌ছিস্। উ-সব ছেনালী রাখ্, ভালয়-ভালয় উঠে উনোনে আগুন দে।'

"তুর মু'য়ে আগুন দিব।"

"কি ব'ল্‌লি ?"—নফরা চোখ পাকাইয়া উঠিল ! ফুলী কিন্তু মোটেই দমিল না। তীব্র কণ্ঠেই বলিল,—'ডর্ ডসাছিস্ তুই কাখে রে ? তুর উ চোখ-রাঙানীকে আমি ডরাই না ! আমি ময়শা বাউরীর বিটি !

নফরার মুখে সহসা কোন কথা ফুটিল না। কিছুক্ষণ **'গুম'**

খাইয়া দাঁড়াইয়া থাকার পর সে পুনরায় দৃঢ় কণ্ঠে কহিল,—'তাহালে রাঁধ্‌বি নাই ভাত ?

'না।'—ফুলীর কণ্ঠেও দৃঢ়তার অভাব ছিল না।···ক্ষুধার্ত্ত নফরা এবার ভারী রাগিয়া উঠিল ! কিন্তু রাগের বশে হঠাৎ কোন একটা অঘটন না ঘটাইয়া গম্ভীরভাবে বলিল,—'বেশ, রাঁধিস্ না তবে।'—বলিয়াই সে ক্ষিপ্রপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

কি ভাবিয়া ফুলী এইবার তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। নফরার পিছু পিছু রাস্তা পর্য্যন্ত আসিয়া ব্যগ্রকণ্ঠেই সে ডাকিল,—এই, যাস্ কুথা ? ফিরে আয়, উনোন ধরাছি।

নফরা কিন্তু ফিরিয়াও চাহিল না; গজ্‌গজ্ করিয়া চলিয়াই গেল।

ফুলী আপন-মনে বলিতে লাগিল,—আর কি তুর ঘরে মন টিক্‌ছে রে ? ইয়ের পর ঐ লখী তুখে পাগল ক'রে ছাড়্‌বেক্ !...

আজ পাঁচ বৎসর হইল, নফরার সহিত ফুলীর বিবাহ হইয়াছে। বাউরী-পাড়ার মধ্যে ফুলীর মত সুন্দরী আর ছিল না বলিলেই হয়। এমন কি গাঁয়ের অনেক ভদ্রঘরের মেয়েও তাহার কাছে হার মানিয়া যাইত।

ছেলেবেলায় ফুলী যখন নফরার সহিত তাহাদের বাড়ী খেলাধূলা করিতে আসিত; তখন হইতেই তাহাকে পুত্র-বধূ

করিবার জন্য নফরার পিতা দীনু বাউরীর মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল। কিন্তু মনের কথা সে বাহিরে কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই। কিন্তু ফুলী বড় হইলে, তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া যখন পাড়ার দুই তিনটি যুবক তাহার পাণি-প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইল; তখন দীনু মহেশ বাউরীর নিকট প্রস্তাবটা আর উত্থাপন না করিয়া পারিল না।

একে ত সুন্দরী মেয়ের বিবাহে একটা মোটা রকম দাঁউ মারিবার আশা মহেশ অনেক দিন হইতেই অন্তরে পোষণ করিয়াছিল;—তাহার উপর মেয়ের বিবাহ-ব্যাপারে যখন সে বেশ একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাধিয়া উঠিতে দেখিল,—তখন সুযোগ বুঝিয়া পণের পরিমাণ রীতিমত বাড়াইয়া দিতেও ইতস্ততঃ করিল না।

সুতরাং ফল এই দাঁড়াইল যে,—ফুলীর দর চড়িয়া যাইতেই অপর সকলে ভগ্নমনোরথ হইয়া একে একে সরিয়া পড়িল। দীনু কিন্তু পিছাইল না। সে একটি একটি করিয়া মহেশের হাতে এক কুড়ি সাত টাকা গণিয়া দিয়া এক শুভদিনে বিজয়ীর আনন্দেই ফুলীকে পুত্র-বধূ করিয়া ঘরে আনিল। ফুলীর মত 'বৌ' পাইয়া নফরার মায়েরও আনন্দের সীমা থাকিল না।

আজ কিন্তু নফরার বাপ-মা কেহই বাঁচিয়া নাই। ছেলের বিবাহের পর দেড়-দুই বৎসরের মধ্যেই স্বামী-স্ত্রী আগু-পিছু করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছে। অবশ্য নফরা ও

ফুলীর মধ্যে তাহারা প্রগাঢ় প্রেমের পূর্ব্বাভাসটুকু দেখিয়া গিয়াছে। এবং প্রকৃতপক্ষে তাহাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসার বিন্দুমাত্রও ত্রুটি ছিল না। বরং তাহা এতই নিবিড় ছিল যে, সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবের দল তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বহু ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং নানা রসিকতাও করিত।...কপোত-কপোতীর মত তাহাদের দিনগুলি এতদিন বেশ সুখে-শান্তিতেই কাটিয়া যাইতেছিল! প্রেমের জ্যোৎস্না-বন্যায় দুইটি তরুণ প্রাণ যেন আত্মহারা হইয়া কোন এক কল্পলোকের দিকে ছুটিয়া যাইত! নফরা জন-মজুর খাটিয়া পয়সা আনিত, আর ফুলী তাই দিয়া গৃহস্থালীর ব্যবস্থা করিত। নফরা যতক্ষণ কাজের মাথায় বাহিরে থাকিত,—ফুলী ঘরের মধ্যে ততক্ষণ নফরার কথাই ভাবিত; আবার ও-দিকে কাজ করিতে করিতে নফরা ক্ষণে-ক্ষণে কেবল ফুলীর মুখখানিই স্মরণ করিত। মোট কথা, উভয়ে উভয়কে কেন্দ্র করিয়া যে শান্তির স্বর্গ রচনা করিয়াছিল,—তাহার বাহিরে আর কিছু আছে বলিয়া তাহারা ভাবিতেই পারিত না। কিন্তু সহসা সবই উল্‌টাইয়া গেল;—গোল বাধাইল ভূষণ বাউরীর মেয়ে লখী আসিয়া।

রূপের দিক্ দিয়া লখী ফুলীর কিছু নিম্নেই যায়। কিন্তু ফুলীর বয়স লখীর চেয়ে কিছু বেশী। সুতরাং রূপের খর্ব্বতা-টুকু লখী বয়সে, তদুপরি উৎকট মাদকের মত তাহার চটুল হাবেভাবে পূরণ করিয়া লইয়াছে!

পাশের গাঁয়ের সূয্যি বাউরীর ছেলে দুলালের সহিত লখীর

বিবাহ হইয়াছিল। দুলালকে কিন্তু তাহার মোটেই পছন্দ হয় নাই। কারণ দুলাল দেখিতেও ভাল ছিল না,—আর এটা-ওটা দিয়া লখীর মনোরঞ্জন করিতেও সে অসমর্থ ছিল। কাজেই স্বামী-স্ত্রীতে এক দণ্ডের জন্যও বনি-বনাও হইত না। দুলাল ভালবাসিয়া লখীকে বশ করিতে না পারিয়া, শেষ পর্য্যন্ত জোরজবরদস্তি আরম্ভ করিয়া দেয়। ফলে "বলাৎ আকৃষ্য-মানাচেৎ সরসা বিরসায়তে"—অর্থাৎ লখী একেবারে বাঁকিয়া বসিয়া একদিন স্বামীর সহিত রীতিমত কোমর বাঁধিয়া ঝগড়া করিয়া বাপের ঘর চলিয়া আসে। দুলালও রাগিয়া-রুষিয়া তাহার আর কোন খোঁজ-খবর লয় না। সম্প্রতি শোনা গিয়াছে,—সে আবার বিবাহ করিয়াছে।

স্বামীর সহিত ঝগড়া করিয়া চলিয়া আসায় ভূষণ কন্যার উপর মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না। তাহা ছাড়া, বসিয়া বসিয়া লখীকে খাইতে দিবার অবস্থাও তাহার নয়। বয়সের দিক দিয়া একেবারে বৃদ্ধ হইয়া না পড়িলেও নানা কারণে তাহার শরীর ভাঙিয়া গেছে। লখীর মা-ও বাঁচিয়া নাই। ভগ্ন দেহ লইয়া ভূষণ জন-মজুর খাটিয়া যে-যৎসামান্য আনিতে পারে,—তাহাতে তাহার নিজেরই দিন চলা ভার! যুবতী কন্যার রাক্ষসী ক্ষুধা সে দুইবেলা কেমন করিয়া মিটাইবে!...লখীর বিবাহ দিয়া সে একটা মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছিল!

কিন্তু লখী যে ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার তাহারই বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিবে, তাহা কে জানিত ?

একদিন কথায় কথায় খুবই রাগিয়া গিয়া ভূষণ লখীকে বলিয়াছিল,—'সোয়ামী' ছেড়ে আমার বুকের উপর এসে চেপে বস্‌বি, বলেই কি আমি তুর বিয়া দিয়েছিলম ?

মুখ ঘুরাইয়া ঝঙ্কার দিয়া লখী জবাব দিয়াছিল,—দিয়েছিলি কেনে অমন হাড়-হাবাতের সাথে বিয়া ? কে তুখে তার জন্যে সাধতে গেইছিল ? সোয়ামী ! হুঁ, অমন সোয়ামীর মুখে মারি ঝাঁটা ! উয়োকে নিয়ে ঘর করতে আমার রঙ্‌ * লেগেছে !

কন্যার মূর্ত্তি এবং বচনের বহর দেখিয়া ভূষণ হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল ; আর বাড়াবাড়ি করিতেও তাহার সাহস হয় নাই।

দুই চারিদিনের মধ্যেই লখী অবশ্য বুঝিতে পারিল যে,—খাইতে দিতে হইতেছে বলিয়াই তাহার বাপ তাহার উপর এত জ্বলিয়া উঠিতেছে। নচেৎ ডোম-বাউরীর ঘরে এমন কত মেয়েই ত স্বামী ছাড়িয়া চলিয়া আসে ; সে আর একটা নূতন করিয়াছে কি ?

যাই হোক্‌ লখী নিজে খাটিয়া রোজগার করিয়া নিজের পেট চালাইতে মনস্থ করিল। হঠাৎ এক সময় ভূষণের প্রতিও তাহার মনটি বড়ই করুণ হইয়া উঠিল ! আহা, তাইত, বুড়ো বাপ-ই-বা তাহাকে কেমন করিয়া খাইতে পরিতে দিবে ! অনেক কষ্টে সে নিজের পেটের যোগাড়টা কোন রকমে করিতে পারে। এ সময় বরঞ্চ তাহাকেই সাহায্য করা উচিত।

* রঙ্‌—রঙ্গ, আমোদ।

তখন গ্রামের সুরথ ঘটক রেললাইনের ধারে একটা ডাঙ্গা কাটাইয়া জমি প্রস্তুত করাইতেছিলেন। ডাঙ্গাটার নাম নিমের ডাঙ্গা।' আগে নাকি সেখানে অনেক নিমগাছ ছিল, তাই ঐ নাম হইয়াছে। অনেক কুলীমজুর সেখানে দিন-ফুরাণে খাটিতেছিল। তাহাদের মধ্যে নফরাও ছিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া লখী একদিন সেইখানেই গিয়া কাজ চাহিল। প্রতি কুলীর একজন করিয়া 'কামিনের' দরকার। কুলী মাটি কাটিবে,—আর কামিন তাহাই ঝুড়ি ভরিয়া মাথায় করিয়া দূরে বা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় ফেলিয়া দিবে। নফরার সহিত যে কামিন কাজ করিতেছিল,—সে আজ দুই তিন দিন আসে নাই ;—আর ফুলীকে কামিনের কাজ করাইতেও নফরা রাজী নয়। সুতরাং একা সবই করিতে তাহার বড়ই অসুবিধা হইতেছিল।

লখী কাজ চাহিতে গেলে,—সুরথ ঘটকের প্রতিনিধি-স্বরূপ যিনি মাটি কাটাইয়ের কাজ-কর্ম্ম দেখা শোনা করিতেছিলেন,—তিনি নফরাকে ডাকিয়া বলিলেন,—ওরে ও নফরা, তোর ত একজন কামিনের দরকার। তা' এই লখীই আজ থেকে তোর কামিনের কাজ করুক, না কি বলিস্ ?

নফরা তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া গেল। আর লখীও আপত্তি করিবার কোন হেতু দেখিল না। সেইদিন হইতেই দুইজনে একসঙ্গে কাজ করিতে আরম্ভ করিল।

—এবং দুই তিন দিন যাইতে না যাইতেই তাহাদের মধ্যে

আরম্ভ হইল হাস্য-পরিহাস; হাস্য-পরিহাস হইতে জন্মিল ঘনিষ্ঠতা, এবং ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া পরিণত হইল ভালবাসায়। আর সেই ভালবাসাই জমিতে জমিতে একদিন—

দেড় দুই মাস পরে নিমের ডাঙ্গার কাজ শেষ হইয়া গেলেও, নফরা ও লখীর গোপন-প্রেমে যবনিকা পড়িল না। কারণ অতনুর অমোঘ ইঙ্গিতে মাটী-কাটাইয়ের মধ্য দিয়া যে বীজ তাহাদের প্রাণের মাটীতে উপ্ত হইয়াছিল,—তাহা ক্রমেই অঙ্কুরিত হইয়া পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিল!

তাহার পর নফরা যখন যেখানেই মজুর খাটিতে যাইত, সুযোগ-সুবিধা পাইলেই লখীকে তাহার সঙ্গিনী করিয়া লইত। অবশ্য এ বিষয় লইয়া কেহ কোনদিন সেরূপ কোন সন্দেহ করে নাই। কারণ আত্মীয়তা না থাকিলেও একই পাড়ার স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া—যেখানে আরও পাঁচজন কাজকর্ম্ম করিতেছে—সেখানে কাজ করিতে যাওয়া ডোম-বাউরী-সমাজে নিন্দনীয় বা অচল নয়। আর ফুলীর সরল প্রাণেও স্বামীর প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ বা অবিশ্বাসের ছায়াপাত হয় নাই। স্বামী খাটিতে যায়, খাটিয়া খুটিয়া পয়সা আনিয়া তাহার হাতে দেয়। পয়সা কমই হোক্,—আর বেশীই হোক্,—ফুলী ভাবে,—স্বামী যেদিন যেমন খাটিতে পারে,—সেইদিন তেমনই লইয়া আসে। ইহারই মধ্যে যে নফরা একটি গুপ্ত প্রণয়িনীর প্রেমে বিভোর হইয়া

উঠিয়াছে,—স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসবশতঃ ফুলী তাহা কোনদিন ধারণা করিতেই পারে নাই।...

কিন্তু ধর্ম্মের কল!—তাহা নাকি আপনা হইতেই নড়িয়া উঠে! কাহারো মনে কোন প্রকার সন্দেহ না জাগিলেও,—ধর্ম্মের কল সেদিন ফুলীর চোখের সামনেই যাহা ঘটাইয়া দিল,—তাহাতে তাহার আর কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। লখী যে স্বামী ত্যাগ করিয়া আসিয়া এখন তাহারই মাথা খাইতে বসিয়াছে,—ইহা ফুলীর নিকট জলের মতই পরিষ্কার হইয়া গেল!

ফুলীর নিকট ব্যাপারটা যতদিন গুপ্ত ছিল, ততদিন নফরাও যেন কতকটা ঢাকাঢাকি দিয়া চলিত। কিন্তু যেই ফুলী সব জানিতে পারিল, অম্‌নি নফরাও যেন ছাড়পত্র পাইয়া গেল। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়,—প্রধানতঃ যাহাকে গোপন করিয়া মানুষ কোন অন্যায় কার্য্যে রত হয়, অথবা যে কার্য্য যাহার জ্ঞাতসারে করা মানুষের বিবেক অন্যায় বলিয়াই মনে করে; তাহার নিকট সেই কার্য্যের স্বরূপ কোনদিন কোন প্রকারে প্রকট হইয়া পড়িলে, মানুষ যেন একটা বাধা অতিক্রম করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়াই ধরিয়া লয়। অবশ্য এ-সব ক্ষেত্রে মানুষের অন্তরের মধ্যে কুপ্রবৃত্তির তাড়নাই প্রবল থাকিতে দেখা যায়। বলা বাহুল্য, নফরার মধ্যেও তাহার অভাব ছিল না। সে ভাবিল,—ভালই হইয়াছে। সে
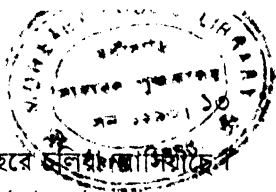
এখন সকল দ্বিধা, সকল সংকোচের বাহিরে চলিয়া আসিয়াছে। এবং প্রেম যখন করিতে হইবে,—তখন এই-ই চাই।

সুতরাং নফরার পরকীয়া প্রেমের লীলা এবার হইতে একেবারে উদ্দাম ও মুক্ত হইয়া উঠিল!

সারাদিন পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়া নফরা এখন আর বাড়ী আসে না, ঐ পথেই লখীকে সঙ্গে করিয়া পচুই মদের দোকানে চলিয়া যায়। সেখানে নিজে ত মদ খায়ই, আবার লখীর গলাতেও খানিকটা ঢালিয়া দেয়। তারপর আরো খানিকটা মদ সঙ্গে লইয়া সে লখীদের ঘরেই ফিরিয়া আসে।

সন্ধ্যার তরল অন্ধকার একটু ঘনাইয়া আসিলে লখীকে লইয়া মাদল বাজাইয়া সে খুব খানিকটা নাচগান করে। মদের কিছু ভাগ সে ভূষণকেও দেয়।

ভূষণ সবই জানে,—সবই বোঝে, এবং সবই দেখে; কিন্তু কিছুই বলে না। কেননা,—সে ইহাই এখন চায়। এবং এই চাওয়ার মূলে তাহার যে উদ্দেশ্যটা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে; তাহাও অনুমান করিয়া লইতে পাড়ার লোকের কষ্ট হয় না।

রাত প্রায় এক প্রহরের বেশী হইলে নফরা ঘরে ফিরিয়া আসে। ফুলী তাহার জন্য ভাত-তরকারী রাঁধিয়া বাড়িয়া ঠিক করিয়া রাখে। নফরা কোন দিন খায়,—কোনদিন বা না খাইয়াই শুইয়া পড়ে।—কথাবার্ত্তাও সে ফুলীর সহিত বড় একটা কয় না। অভিমানে, ব্যথায়, দুঃখে ফুলীর দুই চোখে অবিরল জল

ঝরিতে থাকে . কোন কোন দিন সারা রাত্রি ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চোখ দুইটি ফুলিয়া লাল হইয়া উঠে !

মাঝে মাঝে ফুলীর হাতে কিছু করিয়া পয়সা দেওয়া ছাড়া নফরা যেন তাহার সহিত অন্যান্য সকল সম্বন্ধই চুকাইয়া ফেলিয়াছে।...ফুলী হাত পাতিয়া পয়সা লয়,—শুধু এই ভাবিয়া যে, নফরা আসিয়া খাইতে চাহিলে সে তাহাকে কি খাইতে দিবে ? নচেৎ এরূপ ক্ষেত্রে স্বামীর নিকট হইতে পয়সা লইতে কোন্ স্ত্রীর বুক অভিমানে ফাটিয়া না যায় ?......

বেলা তখন নয়টাই হইবে। নফরা আজ কাজে যায় নাই। কিন্তু সকাল হইতে কোথায় যে গিয়াছে,—তাহারও কিছু ঠিক-ঠিকানা নাই।

মেঝেয় বসিয়া ফুলী ঘরের চালে উদাস দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া যেন কিছু চিন্তা করিতেছিল। চালের অনেক জায়গায় খড় উড়িয়া গেছে ; কিন্তু একটা লাউ গাছ চালের উপর উঠিয়া চারিদিকে লতাইয়া লতাইয়া বড় বড় পাতার সাহায্যে খড়ের অভাব যেন কতকটা পূরণ করিয়া দিয়াছে। তবুও তাহার ফাঁক দিয়া ঘরের মেঝের এখানে সেখানে রৌদ্র পড়িয়াছিল ; আর দুই-তিনটা লাউ ঐ ফাঁক দিয়াই গলিয়া ঘরের মধ্যে চমৎকার দোল খাইতেছিল !

রোদের ছটা ফুলীর মুখের উপরেও আসিয়া পড়িয়াছিল ; তাহাতে তাহার দুই গণ্ডের দুইটি অশ্রু-রেখা চিক্ চিক্ করিয়া

উঠিয়া প্রমাণ করিতেছিল—সে শুধু চিন্তাই করে নাই,—কাঁদিতেওছিল !

সহসা লখী আসিয়া উঠান হইতেই ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া ডাকিল,—নফরা !

ফুলীর চমক ভাঙিল ; কণ্ঠস্বর কাহার বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। কেমন একটা উত্তেজনায় তাহার সর্ব্বশরীর গিস্‌গিস্‌ করিয়া উঠিল ! সে কোন সাড়া দিল না ; যেমন চুপ করিয়া বসিয়াছিল, তেমনিই বসিয়া রহিল।

এ-দিকে লখী নফরার কোন সাড়া-শব্দ না পাইয়া একেবারে ঘরের দুয়ারের সম্মুখে আসিয়া, ফুলীকেই জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল,—নফরা কুথা গেইছে লো ফুলী !

ফুলীর উত্তেজনার যেন আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। তীব্র ঘৃণায় এবং দারুণ বিরুক্তিতে তাহার সমগ্র অন্তর যেন বিষাইয়া উঠিল ! ছিঃ, ছিঃ, এই বেহায়া ছুঁড়িটার কি একটু চক্ষু-সরমও নাই ! নফরাকে তাহার কাছ হইতে ছিনাইয়া লইয়া,—সে কিনা আবার তাহারই সম্মুখে আসিতে পারিয়াছে ! আর শুধু তাহাতেই ক্ষান্ত হয় নাই ; বেশ স্বচ্ছন্দে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছে নফরার খবর !

একেবারে তেলে-বেগুনেই জ্বলিয়া উঠিয়া ফুলী উত্তর দিল,—আমি কি ক'রে জান্‌বো লো, তুর নফরা কুথা ? কিন্তুক ঢের ঢের নচ্ছার ছুঁড়ি দেখেছি লখী,—তুর মতন আর দেখলম নাই। ভাতার ছেড়ে এসে, পরের ভাতার নিয়ে এত

ঢলাঢলি ক'র্‌তে তুর টুগ্‌দু * সরম লাগে না ?...যা, যা, আমার ছাম্‌নে থেকে যা ; তুখে দেখলে আমার মাথা থেকে পা পয্যন্ত জ্বলে যেছে !—শেষের দিকে সে লখার আপাদ-মস্তকে একটা ঘৃণাব্যঞ্জক জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

এত বড় অপমান মুখ বুজিয়া সহিয়া যাইবার মেয়ে লখী নয়। বিশেষ আজ নফরা তাহার হাতের পুতুল ! প্রতি অঙ্গুলী-হেলনে আজ সে নফরাকে যথেচ্ছা ঘুরাইতে ফিরাইতে পারে। তাহা ছাড়া,—রূপ-যৌবনের গরবেও সে আজকাল কাহাকেও বড় একটা ছুঁইয়া যায় না। হেলিয়া দুলিয়া, চোখ পাকাইয়া সে-ও সমান ওজনে,—বরং আর একটু চড়া পর্দ্দায়ই গর্জ্জিয়া উঠিল,—মুখ সাম্‌লে কথা কইবি তুই ফুলী ! নইলে গাল ছিঁড়ে দিব ! তুর ভাতার, তুই রাখ্‌ কেন্‌নে ধ'রে ; তার আবার আমার কাছে মুখ লাড়্‌তে আস্‌ছিস্‌ কিস্‌কে ? তুর নফরা মর্‌তে যায় কেনে লখীর পেছু পেছু ঘুর্‌তে ?—ক্ষ্যামতা থাকে, ধরে রাখিস্‌ !

কি স্পর্দ্ধা !...কথা শুনিয়া ফুলী একেবারে জড়ের মত নিশ্চল হইয়া গেল ! কিছুক্ষণ তাহার মুখে কোন কথাই ফুটিল না। তাহার পর অনেক কষ্টে নিজেকে কতকটা সাম্‌লাইয়া লইয়া সে উষ্ণ অথচ বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে জবাব দিল,—আমি ত আর তুর মতন অত মন্তর-ফন্তর জানিনা লো ! উ-সব তুর জানা আছে।

* টুগ্‌দু—অল্প, একটু।

নফরাকে যে তুই যাদু করেছিস! নইলে যে নফরা এক দণ্ড ফুলীকে না দেখ্‌লে ছট্‌ফট্‌ কর্‌তো—সেই নফরা আজ ফুলীর সাথে দুটো কথাও কয় না!'—তাহার কণ্ঠে রুক্ষতার মধ্য দিয়াই যেন একটা ব্যথার সুরও বাজিয়া উঠিল,—"তুর মতন যক্ষিণীমেয়ে কি আর ভূ-ভারতেও আছে? কত রকমের জড়িবড়ী যে তুই জানিস্‌! ইয়ের পর তুই আরও কত কর্‌বি!'

লখী ভীষণ রুখিয়া উঠিল,—'ত্থাখ্‌ ফুলী',—চীৎকার করিয়াই সে বলিল,—'তুদের ঘরে এসেছি বলে, যা' তা' বলিস্‌ না, বল্‌ছি। আমি তুর 'দেখ্‌তা'' নই। আর অত 'মাগ্‌' সাজিস্‌ না; ভাতারকে বশে রাখ্‌বার মুরদ যার নাই—সে আবার কিসের মাগ্‌ লো?'

'তবেরে হারামজাদী',—ফুলীর রক্ত এইবার গরম হইয়া উঠিল। সম্মুখে পতিত ঝাঁটাগাছটাই তুলিয়া লইয়া সে লখীর দিকে অগ্রসর হইয়া থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা!—দূর! দূর! আমার সোয়ামীকে কেড়ে নিয়ে আবার আমার উপরই তুই চোখ রাঙাস্‌! এক্ষুনি দূর হ' চোখখাকি, গতরখাকি, কুলমজানি,—যা, কুথা তুর নফরা আছে সেইখানে যা। নইলে ঝাঁটার বাড়িতে তুর বিষ ঝেড়ে দিব!

মুহূর্ত্তে প্রলয়ের পূর্ব্বে প্রকৃতির মত লখীর মুখখানা ভীষণ, গম্ভীর ও আরক্ত হইয়া উঠিল! পুচ্ছপিষ্ট সর্পের মত সে রাগে

ফুলিতে লাগিল! শক্তি থাকিলে তখনই হয়ত ফুলীকে গ্রাস করিয়া ফেলিত। একবার তাহার ঠোঁট দুইটা প্রবলবেগে কাঁপিয়া উঠিল! কিন্তু পরক্ষণেই কি বুঝিয়া অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া যেন মুহূর্ত্তে ফাটিয়া পড়িবে, এইরূপ একটা বোমার মতই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল!

সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় নফরা ঘরে ফিরিল। তাহার মূর্ত্তি উগ্র, চুল রুক্ষ, অবিন্যস্ত; চোখ দুইটা দিয়া যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে! ঘরে পা দিয়াই সে ডাকিল, 'ফুলী!' তাহার কণ্ঠ যেমন রূঢ় আবার তেমনি গম্ভীর!

ফুলী প্রথমে কোন জবাব দিল না।...'অ্যায় ফুলী!'—নফরা এবার যারপরনাই কর্কশ ও বিকৃত স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—'শুন্‌তে পেছিস্ নাই? কালা হয়েছিস নাকি?'

নিতান্ত অপ্রসন্নভাবেই ফুলী এবার জবাব দিল,—কেনে কি বলছিস্ কি?

"তুই আজ লখীকে ঝাটা মারতে গেইছিলি কেনে?"

ফুলীর বুঝিতে বাকী থাকিল না যে, লখী তাহার বিরুদ্ধে নফরাকে নালিশ করিয়াছে এবং তাহার জন্যই নফরা একেবারে মেজাজ গরম করিয়া ঘরে ঢুকিয়াছে।...কিন্তু সে ভয় পাইল না। দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল,—বেশ করেছি! ইখানে সাউখুড়ী মারাতে আসে কেনে?"

'খুব আসবেক্, একশ'বার আসবেক্।'—নফরা উত্তেজিত
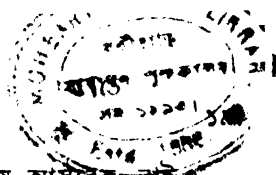
কণ্ঠেই বলিল,—'ই-কি তুর বাবার ঘর যে আসবেক্ নাই ?'—বলিতে বলিতে সে একপা একপা করিয়া ফুলীর দিকে আগাইয়া আসিল,—'বল্, কেনে উয়োকে ঝাঁটা মারতে গেইছিলি ? তুর এত গরব কিসের ?' বলিতে বলিতে সে একটা ভীষণ ক্রুদ্ধভাব প্রকাশ করিল।

"ওমা, ই-খাল্‌ভরার আবার রাগ দেখ !"—ফুলী এক পা পিছাইয়া গিয়া বলিল,—"লখীর দুখে বুক যেন চড়্‌চড়্ করছে !" যুগপৎ কেমন একটা শঙ্কা এবং অভিমানের ভাব যেন তাহার দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিল। তবুও সে না দমিয়াই বলিয়া চলিল,—'বেশ করেছি ঝাঁটা নিয়ে তেড়েছি। উয়োর বাবার ভাগ্যি যে,—উয়োর পিঠে ঝাঁটা পড়ে নাই। ফের যদি আসে,—ঝাঁটা মারবো, তবে ছাড়বো।"

"কেনে, উ তুর করলেক্ কি ?"—নফরার ক্রোধের মাত্রা যেন ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতেছে !

অভিমানাহত কণ্ঠে ফুলী জবাব দিল,—"তুই কি করে জান্‌বি রে, উ আমার কি করেছে ! মেয়েমানুষ হ'তিস ত বুঝ্‌তিস ! মরদ মানুষ তুই,—তুই আর ই-সবের কি বুঝবি ? উ আমার—"

শেষের দিকে ব্যথার আবেগে তাহার কণ্ঠ হঠাৎ রুদ্ধ হইয়া গেল। সে আর কিছু বলিতে পারিল না, প্রায় কাঁদিয়াই ফেলিল !

মোহাচ্ছন্ন নফরা কিন্তু ফুলীর সে অশ্রুর মর্ম্ম বুঝিল না।

চোখ পাকাইয়াই সে বলিল,—"উ সব ঢঙ্ রাখ ; বল্, লখীকে ঝাঁটা নিয়ে মারতে গেইছিলি কেনে ?"—সঙ্গে সঙ্গে সে ফুলীর চুলের মুঠি ধরিল।

ফুলী যেন আর সহিতে পারিল না। উঃ—এই তাহার সেই স্বামী,—যে একদিন, তাহার নাম করিতে আত্মহারা হইয়াছে! আজ লখীর প্রতি অপমান-বোধে—সেই একান্ত অনুরক্ত স্বামীই কি-না তাহার চুলের মুঠি ধরিয়াছে! অথচ লখী যে তাহাকে তাহার কত বড় অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে,—নারী হইয়া তাহার নারী-জীবনে কী যে দুর্ব্বিষহ অনল জ্বালিয়া দিয়াছে,—তাহার স্বামী ত আজ তাহা একবার ভাবিয়াও দেখিতেছে না! ফুলীর চক্ষে শ্রাবণের বান ডাকিল। তাহার কণ্ঠও ভাষা হারাইয়া ফেলিল!

লখীর প্রতি অপমানের শোধ লইবার জন্য ফুলীকে প্রহার করিতেই যে নফরা ঘরে আসিয়াছিল, তাহা বলাই বোধ হয় বাহুল্য। কিন্তু আসিয়াই ত আর ঘা-কতক লাগাইয়া দেওয়া চলে না;—তাই এতক্ষণ ধরিয়া সে যেন একটা অবস্থার সৃষ্টি করিতেছিল। এক্ষণে সুযোগ বুঝিয়া একটা প্রচণ্ড চড় ফুলীর গালে কষাইয়া দিয়া সে গর্জ্জিয়া উঠিল,—কেনে তুই উয়োকে ঝাঁটা মার্‌তে যাবি? উ তুর বাবার খায়, না পরে? বল্, আর কখ্‌খনো উয়োর মু'য়ের উপর রা-টী কাড়্‌বি নাই?

অযথা মার খাইয়া অত্যধিক দুঃখে ও রাগে ফুলী যেন

গরিয়া হইয়া উঠিল এবং নিতান্ত অসহিষ্ণুভাবেই বলিল,—"খুব কাড়্‌বো, খুব কাড়্‌বো, একশ'বার কাড়্‌বো। উয়োর মু'য়ে খড়ের নুড়ো জ্বেলে দিব।"

আর যায় কোথা ? নফরা যেন ক্ষেপিয়া গিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল,—'তবেরে হারামজাদি,—আজ তুর-ই একদিক্ কি—আমারি একদিক্ ;—দেখি, আজ তুখে তুর কুন্ বাবা এসে রক্ষে করে !'—বলিতে বলিতে সে ফুলীকে একটা প্রবল ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিয়া,—তাহার বুকের উপর বসিয়া তাহাকে বেদম প্রহার করিতে সুরু করিয়া দিল।

প্রহারের যন্ত্রণায় ফুলী উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল !...তাহার কান্নার শব্দে পাড়ার দুইচার জন পুরুষ ও মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল,—নফরা যেন ফুলীকে মারিয়া ফেলিতেই বসিয়াছে।... যাই হোক, তাহারা অনেক কষ্টে নফরার কবল হইতে ফুলীকে মুক্ত করিয়া দূরে লইয়া গেল। নফরা সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তখনো রাগে ফুলিতেছিল। যেন ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের গ্রাস হইতে কেহ তাহার শিকার কাড়িয়া লইয়াছে !

নিষ্ফল আক্রোশে কিছুক্ষণ উন্মত্তের মত এদিক-সেদিক পায়চারী করিতে করিতে হঠাৎ এক সময় নফরা প্রবল দমকা বাতাসের মতই ঘর ছাড়িয়া কোথায় বাহির হইয়া গেল। অতঃপর পাড়ার লোকে ফুলীকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিয়া এবং সেই সঙ্গে কিছু কিছু উপদেশ দিয়াও যে-যা'র গৃহে প্রস্থান করিল।...

ধূলায় লুটাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ফুলী নীরবে অনেক অশ্রুই বিসর্জ্জন করিল। কিন্তু মনকে সে কিছুতেই শান্ত করিতে পারিল না। নফরা আজ শুধু তাহার অঙ্গেই আঘাত করে নাই; তাহার মর্ম্ম-ও ভাঙিয়া চূরমার করিয়া দিয়াছে!... বিবাহের পর হইতে প্রত্যেকটি দিনের স্মৃতি আজ ফুলীর চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। আগেকার দিনগুলি কত উজ্জ্বল,—কি মধুর বসন্তের বাতাসই না তাহার উপর দিয়া বহিয়া গেছে!...সে সকল দিনের কথা ভাবিতেও যেন এক স্বর্গীয় সুখের আবেশে সর্ব্বাঙ্গ এলাইয়া পড়ে!...দেখিতে দেখিতে সে উজ্জ্বলতা হঠাৎ যেন একটা ভয়াবহ নিবিড় আঁধারে মিলাইয়া গেল; সেই মধুর বসন্ত-বাতাসের স্থলে হঠাৎ প্রবাহিত হইল, যেন নিদাঘ-দ্বিপ্রহরের জ্বালাময় উত্তপ্ত ঝঞ্ঝা! উঃ, কি ভীষণ! ফুলী যেন ভয়ে চম্‌কাইয়া উঠিল! না, না, স্বর্গ-সৌধ ভাঙিয়া গিয়াছে,—সঙ্গে সঙ্গে এক যন্ত্রণাময় নরককুণ্ড গড়িয়া উঠিয়াছে! তাহার মধ্যে সে আর থাকিতে পারিবে না!...

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। অবিন্যস্ত কাপড়টাকে ভাল করিয়া গুছাইয়া লইয়া ঘরের মধ্যে আসিল। মাত্র দুই এক মুহূর্ত্তের জন্য ঘরের এদিক সেদিক চাহিয়া সে তৎক্ষণাৎ আবার ঘরের বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পর দরজার শেকল তুলিয়া দিয়া সেই দণ্ডেই রাস্তায় নামিয়া একেবারে বাপের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

জামাইয়ের মতিগতি যে খারাপ হইয়াছে, ইহা মহেশ বাউরীর

অবিদিত ছিল না। তাহা ছাড়া,—আজ নফরা ফুলীর প্রতি যে অমানুষিক নির্য্যাতনটা করিয়াছে,—তাহার সংবাদও ইতিমধ্যেই লোক-পরম্পরায় মহেশের কাণে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। বার্দ্ধক্যের ভারে নিতান্ত জব্দ হইয়া না পড়িলে সে বোধহয় নফরাকে এতক্ষণ একচোট দেখিয়াই লইত!

কাজেই ফুলীকে সহসা এইভাবে চলিয়া আসিতে দেখিয়া সে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হইল না! বরঞ্চ ফুলীর বিষণ্ণ মুখ, লাঞ্ছিত আলু-থালু বেশ তাহার হৃদয়ে যুগপৎ একটা ব্যথা ও উত্তেজনা জাগাইয়া তুলিল! সে আকুল স্নেহে বলিয়া উঠিল,—'আয়, আয়, বেশ করেছিস, চলে এসেছিস। উ হতভাগার ঘরে আর থাকতে হবেক নাই। কি ব'লব, বুড়া হয়েছি, গায়ে এক ছটাক বল নাই; নইলে নফরা বেটাকে একবার দেখেই নিতম। উয়োর বাপ তুখে ঘরের বৌ করতে আমার কত হাতে পায়ে ধরেছে,—তা কি আজ উ ছোঁড়ার মনে আছে? আজ থাক্‌ত উয়োর বাপ বেঁচে!'—বলিতে বলিতে হঠাৎ গলার স্বর আটকাইয়া গিয়া সে খক্ খক্ করিয়া কয়েকটা কাশিল, পরে আবার বলিল,—'থাক্ তুই ইবার থেকে আমার ঘরে; বাউরীর মেয়ে, খাট্‌বি, খাবি। কি করব, দেখছিস ত আমার দশা? না হয় আমিই যেমন করে পারি, তুখে খেটে খাওয়াতম! আয়, আয়, আমার কাছে এসে বোস্। তুর মা এখনো মাঠের কাজ থেকে আসে নাই; হয়ত পয়সা-পাতি পেতে দেরী হছে।

স্বামীর নির্য্যাতনের বেদনার উপর পিতৃ-স্নেহের প্রলেপ

পড়িতে ফুলীর দুঃখাবেগের বাঁধ যেন আবার ভাঙিয়া পড়িয়া তাহার চক্ষে দর্‌দর্‌ করিয়া কতকটা জল ঝরিয়া পড়িল! পিতার অলক্ষিতে অঞ্চল দিয়া চোখ দুইটা মুছিয়া সে বহু কষ্টেই নিজেকে সামলাইয়া লইল। তারপর ধীরে ধীরে আসিয়া পিতার পার্শ্বে উপবেশন করিল।

ফুলীর মা বলিয়া মহেশ যাহাকে উল্লেখ করিল. সে ফুলীর গর্ভধারিণী নয়,—মহেশের সাঙ্গা-করা বৌ,—ফুলীর বিমাতা। ফুলী বাল্যেই মাতৃহারা। অবশ্য তাহার বিমাতা ভাবিনী বরাবরই তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে। ভাবিনীর পূর্ব্ব-পক্ষের স্বামীর ঔরসজাত একটি মেয়ে আছে,—মেয়েটির বিবাহ হইয়া গিয়াছে। মহেশের ঔরসে তাহার কোন সন্তানাদি হয় নাই। মহেশের পূর্ব্ব-পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে আরও দুই একটি ছেলে-মেয়ে হইয়াছিল বটে,—কিন্তু তাহারা অকালেই মহেশকে ছাড়িয়া গিয়াছে।

পিতার কাছে বসিয়া ফুলী দুই একটা কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে,—এমন সময় ভাবিনী ঘরে ফিরিল। বলা বাহুল্য, সে বাহিরে কার্য্যে লিপ্ত ছিল বলিয়া এদিককার ব্যাপার কিছুই জানিত না। ফুলীকে বিমর্ষভাবে স্বামীর পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখিয়া সে একটু বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিল,—ওই ফুলী, তুই ই-সময় ইখানে যে,—তুর মুখও যেন ভার ভার লাগছে; কি হয়েছে কি?

ফুলী কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মহেশ যতটা সংবাদ পাইয়াছিল,

স্ত্রীর নিকট পরিচয় দিয়া যেন কিছু উত্তেজনার সহিতই বলিল—তুই-ই বল্ ত ভাবি, নফরা হারামজাদার মতিচ্ছন্ন ধরেছে কিনা! আজ যদি ময়শার গায়ে জোর থাক্‌ত,—উয়োর জিভ টেনে বার করে দিতম নাই? আমার ফুলীর মতন কন্যে, উ-হারামজাদা পরের একটা লচ্ছার মেয়ের সাথে জুটে,—তার উপর করে কিনা অবিচের,—আবার মারধোর? ই—তুই ঠিক জানিস্ ভাবি,—শেষতক ঐ নফরার কপালে অনেক দুঃখু আছে!

"আছেই ত!"—ভাবিনীর কণ্ঠেও যেন উত্তেজনার সুর বাজিয়া উঠিল,—"নইলে ফুলীর মুখের দিকে না চেয়ে, লখীকে নিয়ে ঢলাঢলি করবেক কেনে?—তুই কালই বিহানে একবার হাকিমের কাছে যেয়ে, নফরার নামে লালিশ করে আয়। ই-কি মগের মুলুক হয়ে গেইছে নাকি?"

'হাকিম' বলিয়া ভাবিনী যাহাকে উল্লেখ করিল,—তিনি গ্রামের কমল বাড়ুয্যে,—স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। ডোম-বাউরীদের এমন অনেক হাঙ্গামার বিচার-নিষ্পত্তি তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে করিতেই হয়।

ভাবিনীর কথায় উৎসাহ পাইয়াই মহেশ বলিয়া উঠিল—ঠিক বলেছিস্ তুই। কাল বিহানেই আমি,—আমার যত কষ্টই হোক,—হাকিমের কাছে যেয়ে লালিশ করবো। তা'পর, নফরাই থাকে কি অমিই থাকি।

সহসা ফুলী বলিয়া উঠিল,—"থাক্ বাবা, আর উ-সবে কাজ নাই। ই-নিয়ে আর হাকিমের কাছে যেতে হবেক নাই।

লোকে ছিঃ ছিঃ কর্‌বেক্‌,।"—পরে ভাবিনীর দিকে চাহিয়া বলিল,—"মা, উ-সব কথা ইয়ের পর হবেক, এখন তুই সাঁজের আলা জ্বাল্‌। সাঁঝ কখন বাঁউড়ে গেইছে!"—তাহার কথায় ভাবিনীর হুঁস্‌ হইল,—তাইত, কখন সাঁঝ হইয়াছে,—অথচ সাঁঝের দীপ এখনও জ্বালা হয় নাই! সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকিল। মহেশও উপস্থিত নফরার কথা বাদ দিয়া তামাক খাইবার উদ্দেশ্যে বাহিরে চলিয়া গেল।

* * *

কিছুক্ষণ হইল সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ঝুমুর গানের সুরে,—মাদলের গম্ভীর নিনাদে বাউরীপাড়ার চতুর্দ্দিক মুখরিত। সারাদিনের কর্ম্মক্লান্তির পর—রীতিমত হাঁড়িয়া পান করিয়া পাড়ার প্রায় সকলেই এ সময়টা একটু আমোদ-প্রমোদ করে।

ভূষণ বাউরীর উঠানে কদমগাছের তলায় বসিয়া হাঁড়িয়া-পানোন্মত্ত নফরাও মহানন্দে মাদল বাজাইতেছিল। আর লখী মাদলের তালে তালে নাচিতে নাচিতে ঝুমুর ধ'রিয়াছিল,—

নিতুই কেনে যাস্‌ যমুনার কূল্‌-লো,
নিতুই কেনে যাস্‌ যমুনার কূল্‌!
কার বাঁশরীর সুরে লো তুর
'পান্‌' করে আকু-ল্‌-লো—
'পান্‌' করে আকুল্‌!!

লখীর সুমিষ্ট গলার কাঁপা-কাঁপা সুরে—কদম তলায়

'যমুনা' ও বাঁশরীর গানে চারিদিকে যেন মদিরা ঝরিয়া পড়িতেছে! হাঁড়িয়ার নেশার উপর নফরার যেন আরও একটা কিসের নেশা লাগিয়া যাইতেছে! প্রবলভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে সে মাদলে চাটি দিতেছে.—আর বলিতেছে.—সাবাস, লখী, সাবাস! পায়ে দু'টো ঘুঙুর বেঁধে আস্‌তে পারিস্ ত আরও ভাল হয়।

নাচের ফাঁকেই লখী ফিক্ করিয়া একটু মন-কাড়া হাসি হাসিয়া জবাব দিতেছে,—'দূর্ খালভরা!'—সঙ্গে সঙ্গে আবার গান ধরিতেছে,—

ঘরে কি তুর মন সরে না—
ও-গরবী রাইলো—
ও-গরবী রাই!
"কুল-মজানী" বল্‌লে তুরে—
'লজ্জে' বড় পাইলো
লজ্জে বড় পাই॥

সহসা আর ভাব দমন করিতে না পারিয়া মাদল কাঁধে তুলিয়াই নফরা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং লখীর পিছু পিছু মাদল বাজাইতে বাজাইতে নিজেও গান ধরিয়া দিল,—

মজেছি সই, তুর পীরিতে
ছাড়্‌তে লারি তুরে লো
ছাড়্‌তে লারি তুরে,—

চল্ সখি, চল্ তুরে নিয়ে
যাই লো চলে দূরে লো—
যাই লো চলে দূরে ॥

গাহিতে গাহিতে নফরা একেবারে যেন সব ভুলিয়া গিয়া—লখীর গলা ধরিয়া তাহার গালে একটা—

মুহূর্ত্তে লখীর সর্ব্বাঙ্গে বিপুল শিহরণ খেলিয়া গেল,—তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল,—টপ্ করিয়া এক পা দূরে সরিয়া গিয়া চটুল কটাক্ষ হানিয়া সে বলিল—'ধ্যেৎ, তুই ভারী ইয়ে! হুই চালায় বাপ বসে আছে জানিস্!—দেখ্‌তে পাবেক্ নাই?

"হুঁ, দেখতে পাবেক্!"—নফরা ভাবের ঘোরেই উত্তর করিল,—'আঁধারে তুর বুড়া বাপের চোখ জ্বল্‌ছে বুঝি,! আর উ-ত কিছু জানে না? পেলেক্ ত—'

এমন সময় নিতান্ত রসভঙ্গ করিয়া ভূষণ কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব উচ্চ করিয়াই হাঁকিল,—নফরা! ও-নফরা!

নফরা একটু চকিত হইয়াই উত্তর করিল.—'কেনে হে, কি বল্‌ছিস?'

ভূষণ উচ্চ কণ্ঠেই বলিল,—"লাচগান এখন রাখ,—এইখেনে একবার আয়; তুর সাথে কথা আছে।"

'আঃ, ই-সময় আবার তুর কি কথা রইলো হে?"—বিরক্ত হইয়াই নফরা কাঁধের মাদলটা সেইখানে নামাইয়া বলিল,—দাঁড়া লখী, তুর বাপ্ কি বলছে শুনে আসি।

পরে চালার নিকট আসিয়া একটু দূর হইতেই সে ভূষণের উদ্দেশে প্রশ্ন করিল,—"বল্‌হে, কি ব'ল্‌ছিস্‌।"

"ই-খুব জরুরী কথা"—ভূষণ উত্তর দিল,—"তুই আমার কাছে এসে বোস্‌।"

নফরা আর কি করিবে?—ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া ভূষণের পাশে গিয়াই বসিল।

চালাটার এক কোণে একটা টিন্‌ ল্যাম্প টিম্‌টিম্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল। তাহাতে অবশ্য সেখানকার অন্ধকার ঠিক দূর হয় নাই;—তবে সেই স্বল্পালোকে এ-উহার মুখ বেশ দেখিতে পাইতেছিল।

ভূষণ আরম্ভ করিল,—"ত্যাখ্‌ নফরা, ই-ত খুব ভাল হছে নাই! লোকে—"হঠাৎ থামিয়া গিয়া সে দুই একটা কৃত্রিম কাশিই কাশিল। তাহার পর আবার বলিল,—'লোকে নানা-দিকে নানা কথাই ব'ল্‌ছে; আর আমার বদ্‌নাম হছে। ইয়ের পর মোড়লরাও হাঙ্গামা ক'রবেক, পঞ্চায়েৎ ডাক্‌বেক, আমাকে একঘরে কর্‌বেক। তখন ঠ্যালা সাম্‌লাবেক কে বল্‌ দেখি? ইয়ের বেবস্থা না কর্‌লে কি আর চলে?"

অত সব ভূমিকা নফরার ভাল লাগিতেছিল না। মন যখন রঙে রঙে লাল হইয়া উঠিয়াছে,—তখন রসভঙ্গ করিয়া ডাকিয়া ঐ-সব সমস্যাজনক কথা কাহারই-বা ভাল লাগে? সুতরাং বিরক্ত হইয়াই নফরা জবাব দিল,—'কি ব'ল্‌ছিস্‌, পষ্ট করেই বল ত হে! আমি উ-সব 'সতর-পনর' কিছুই বুঝ্‌তে লার্‌ছি।'

"ই-আর বুঝ্‌তে লার্‌লি!"—নফরার নির্ব্বুদ্ধিতায় যেন কিছু বিস্মিত হইয়াই পরম বিজ্ঞের মত ভূষণ বলিল,—'বলি, তুদের যখন এত ভালবাসা, এত মনের মিল,—তখন লখীকে ইবার তুই সাঙ্গা ক'রে ফ্যাল কেন্‌নে? নইলে লখীকে আমি আর তুর সাথে মিশ্‌তে দিব নাই। ইয়ের পর ঠিক দেখে লিস্‌, মোড়লরা পঞ্চায়েৎ ডেকে আমার অপমানের একশেষ ক'রবেক,—আর লখীরও কিছু বাকী রাখ্‌বেক নাই। তুর কি? তুই তখন মজা মেরে স'রে পড়্‌বি। তাই বল্‌ছি, হয় তুই ইবার লখীকে সাঙ্গা কর্‌—না হয় কাল থেকে আমার ঘর আর আসিস্‌ না।'

সাফ্‌ জবাব পাইয়া নফরার বুকটা ধড়াস্‌ করিয়া উঠিল! যাহা না করিলে লখীকে হারাইতে হইবে,—তাহা না করিবার মত মনের জোর তাহার একেবারেই ছিল না। অধিকন্তু লখীর সহিত ছাড়াছাড়ি হইবার কল্পনাতেও সে শিহরিয়া উঠিল! এবং মুহূর্ত্ত মাত্র কোনদিক চিন্তা না করিয়াই উত্তর দিল,—ও,—এই কথা? তা' তার জন্যে আর ভাবনা কি হে? দে না তুর যবে ইচ্ছে আমাদের সাঙ্গা দিয়ে।"—পরে হো-হো করিয়া খুব এক চোট্‌ হাসিয়া লইয়া—"আঁা, মজা মেরে আমি সরে পড়্‌বো? বলিস্‌ কি হে, লখীকে কি আমি তেমনি ভালবাসি?...তুর যবে খুশী, আমাদের সাঙ্গার দিন ঠিক কর—আমি রাজী আছি।"

ভূষণ এতদিন ধরিয়া ঠিক এইটাই চাহিতেছিল। লখী

স্বামী ছাড়িয়া আসিয়াছে,—এখন নফরার সহিত তাহার সাঙ্গা দিতে পারিলেই সে হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচে! আর সেই জন্যই সে নফরাও লখীর মধ্যে এতটা ঘনিষ্ঠতা জমিয়া উঠিবার সর্ব্বপ্রকার সুযোগ দিয়াছিল। নফরা ও লখীর অবৈধ প্রণয়ে সে সম্যক বাধা সৃজন করিতে পারিত না সত্য ;—কিন্তু অন্তরে ঐ গূঢ় উদ্দেশ্যটি না থাকিলে,—এতটা বাড়াবাড়ির মুখে অবশ্যই বাধা হইয়া দাঁড়াইত। এখন সে পরম নিশ্চিন্ত হইয়াই আহ্লাদের সহিত বলিল,—"হেঁ-হেঁ সে-কি আর আমি জানিনা রে,—লখীকে তুই কত ভালবাসিস্! তা' আমি জলদীই তুদের সাঙ্গা দিয়ে দিব। কিন্তুক তাতে ত তুর কিছু খরচা আছে নফরা!"

"কি খরচ আছে হে?"—নফরা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—"বল্ জলদী,—কদমতলায় লখী ইকা বসে আছে।"

লখী তখন অবশ্য কদমতলায় বসিয়া ছিল না।—নফরার অজানিতভাবেই সে তাহার পিছু পিছু আসিয়া আড়াল হইতে সমস্তই শুনিতেছিল।

ভূষণ বলিল,—তা' খরচ কিছু আছে বৈ-কি?—ধর্ এই সাঙ্গাত-কুটুম, আপনারজনদের একদিন মদভাত খাওয়াতে হবেক। তাছাড়া,—লখীকে এক জুড়া লালপাড় শাড়ী দিতে হবেক্। আর পুরুতঠাকুরও একটাকা পাঁচ সিকে লিবেক্। আর—হেঁ-হেঁ—আমি কনের বাপ,—হেঁ-হেঁ আমারও ত দু'এক টাকা মান্যি আছে?—তা সবসুদ্ধ গুটা বার টাকাই ধর্।

নফরার হয়ত পুঁজি কিছু ছিল,—বা কোন উপায় ছিল। তাই সে কোন দ্বিধা না করিয়াই বলিয়া উঠিল,—আচ্ছা, আচ্ছা, তুই সাঙ্গার দিন ঠিক কর,—আমার যা খরচ আছে, তা' আমি দিব।

ভূষণ যেন কৃতার্থ হইয়া গেল এবং বেশ খোস্ মেজাজেই বলিল,—বেশ, বেশ, আর কিছু ব'ল্‌তে হবেক নাই তুখে। যা' তুরা ইবার ধূরুপ * ফূর্ত্তি কর্‌গা।

নফরা চালা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিতেই লখী ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল,—আমি তুদের কথা সব শুনেছি।

লখীর হাসিটুকু নফরা দেখিতে না পাইলেও, তাহার সান্নিধ্য সে বেশ ভালভাবেই অনুভব করিল এবং উচ্ছ্বসিত আনন্দে তাহার হাত ধরিয়া আবার কদমতলায় আসিল।

একটু পরেই মাদলে আবার চাটি পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে লখীও ঝুমুর ধরিল,—

"নিতুই কেনে যাস্ যমুনার কূল লো—
নিতুই কেন যাস্ যমুনার কূল"—

* * * *

এক সপ্তাহের মধ্যেই ভূষণ তৎপর হইয়া নফরা ও লখীর সাঙ্গা দিয়া ফেলিল। ইহাতে পাড়ার কেহ কেহ বা ফুলীর হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিল; আবার কেহ কেহ বা ভূষণের দিকে দাঁড়াইয়া তাহাকে সমর্থন করিল। জগতে প্রায় সকল স্থলেই

* ধূরুপ—প্রচুর, খুব বেশী, যত ইচ্ছা।

এইরূপ হইতে দেখা যায়। কাজ ভালই হউক, আর মন্দই হউক, প্রত্যেক কাজেরই একদল বিরুদ্ধবাদী,—এবং একদল সমর্থক হইয়া দাঁড়ায়। সমর্থক না জুটিলে, যাহা দশের মতে মন্দ কাজ বলিয়া পরিগণিত, তাহা এত অধিক পরিমাণে সম্পন্ন হইতে পারিত না।

ফুলীকে মারধোর করিয়া নফরা একরূপ তাড়াইয়াই দিয়াছে,—ফুলীও আর নফরার ঘর যায় নাই ; সাদা কথায় স্বামী-স্ত্রীতে ছাড়াছাড়িই হইয়া গেছে। তবু তাহা মহেশের প্রাণে সহ্য হইয়াছিল,—কিন্তু নফরা যখন সত্যসত্যই লখীকে সাঙ্গা করিয়া বসিল, তখন বৃদ্ধ মহেশের পাঁজরাগুলোও যেন ব্যথায় ভাঙিয়া পড়িতে চাহিল! এতদিন যে অনুভূতি তাহাকে ফুলীর ব্যথা সহ্য করিবার শক্তি দিয়াছিল,—তাহার মধ্যে এই ইঙ্গিতটুকুই প্রচ্ছন্ন ছিল যে,—হোক্ স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া-বিবাদ,—করুক নফরা লখীকে লইয়া অবৈধ প্রণয় ;—তাহা দু'দিনের। মধ্যে একটা ব্যবধান সম্প্রতি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেও নফরা ফুলীরই আছে,—ফুলীও নফরার আছে। দু'দিন পরেই আবার দু'য়ে এক হইয়া যাইবে। কিন্তু লখীও নফরার সাঙ্গার পর,—মহেশের সে সান্ত্বনা-সৌধ ভাঙিয়া ধুলিসাৎ হইয়া গেল। সে দেখিল, তাহার ধারণা তাহাকেই ঠকাইয়াছে!

ভাবিনীকেও ইহাতে একটু বিচলিত হইতে দেখা গেল। সে-ও মহেশকে সাঙ্গাই করিয়াছে সত্য,—কিন্তু স্বামী ছাড়িয়া এবং অন্য একটি নারীকে স্বামী হইতে বঞ্চিত করিয়া ত নহে?

সে বিধবা হইয়া বিপত্নীক মহেশকে সাঙ্গা করিয়াছে। সুতরাং তাহার সাঙ্গা করায়,—আর লখীর সাঙ্গা করায় অনেক প্রভেদ—এমন কি স্বর্গ-নরক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 'নফরা ও লখীর কাণ্ডটিকে' ভাবিনীও তাই একেবারে সমর্থন করিতে পারিল না এবং ফুলীর উপর এই অন্যায় অবিচারটা হইয়া যাওয়ায় সে ব্যথা দমন করিতে না পারিয়া দুই-চার ফোঁটা চোখের জলও ফেলিল।

আর ফুলী ?—যাহার সবচেয়ে মুষ্‌ড়াইয়া পড়িবার কথা,—সেই ফুলীকে কিন্তু বাহির হইতে বিন্দুমাত্রও চঞ্চল বলিয়া মনে হইল না। বরঞ্চ হাবেভাবে ইহাই যেন সে প্রকাশ করিতে চাহিল যে, তাহার কিছুই হয় নাই,—কিছু যায় নাই ;—এমন কি ঐ অপ্রীতিকর ব্যাপাটার সহিত তাহার কোন সম্পর্কই নাই।

কিন্তু এগুলি যে নিতান্তই তাহার বাহ্যিক,—এবং ইহাদের সহিত তাহার অন্তরের যে কণামাত্রও মিল নাই ,—বৃদ্ধ মহেশের তাহা বুঝিতে একেবারেই বাকী ছিল না। এবং এই মানসিক দ্বন্দ্বে ফুলী ভিতরে ভিতরে যে কি পরিমাণ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠিতেছিল,—তাহাও মহেশ যেন স্বীয় অন্তর দিয়াই অনুভব করিতে পারিতেছিল। কিন্তু কি করিবে সে ? অক্ষম বা নিরুপায়ের মনের জ্বালা যে মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখিতে হয় !

কিন্তু মহেশকে শেষ পর্য্যন্ত চুপচাপ বসিয়া থাকিতে দিল না—তাহার বাল্যবন্ধু কাঙাল বাউরী। কাঙালের কোন

সন্তানাদি ছিল না,—ফুলীকে সে আপনার কন্যার মতই স্নেহের চক্ষে দেখিত। কাজেই ফুলীর উপর—এই অত্যাচারটা—নিরুপায় মহেশ একান্ত বাধ্য হইয়াই সহ্য করিলেও,—কাঙাল তাহার প্রতিকার করিতে যেন ক্ষেপিয়াই উঠিল!

মহেশের নিকট আসিয়া সে বলিল,—"কি-হে সাঙাত,—আমাদের চোখের উপরে নফরা এতবড় একটা অবিচের করলেক্, আর আমরা চুপ্-চাপ সব সয়ে যাব? ই-কি কখন' হয়? উ-ব্যাটাকে শায়েস্তা করতেই হবেক্। ফুলীর কি দোষ তুই-ই বল্‌ত হে?"

মহেশ দরদী বন্ধু কাঙালের এই সহানুভূতিতে আপনাকে যথেষ্ট কৃতার্থ জ্ঞানই করিল। দুঃখের অংশ গ্রহণ করিয়া মানুষের দুঃসময়ে যে প্রকৃতই সহানুভূতি লইয়া আসে,—তাহাকে পাইয়া দুঃখীর একটা পরম সান্ত্বনা লাভ হয় সন্দেহ নাই। সে অন্ততঃ এই ভাবিয়াও শান্তি পায় যে,—তাহার দুঃখে ব্যথিত হইবার, তাহার দুঃখে চিন্তা করিবার, তাহার দুঃখকে নিজের বলিয়া ভাবিবার অন্ততঃ একটা লোকও সংসারে আছে!

মহেশ আগ্রহের সহিত কাঙালের ডান হাতটা ধরিয়া বলিল,—তুই যা বলছিস,—তা একদম খাঁটি! কিন্তুক, আমি কি করি বল দেখি, ভাই? গায়ে জোর থাক্‌লে নফরার মাথাই আজ পেড়ে দিতম, বুঝলি! ইয়ের চেয়ে ফুলী 'নাড়' * হত, সেও ভাল। এখন যে কি করি, কিছু বুঝতে লার্‌ছি।

"বুঝবি আর কি?" কাঙাল উত্তেজনার সঙ্গেই

* নাড়—বিধবা।

বলিল,—"চল্, এক্ষুনি হাকিমের কাছে যাই। মেড়েলদের বিচেরে কিছু হবেক নাই। সাঙ্গার দিন সব শালাই ভূষ্ণোর ঘরে যেয়ে মদ মেরে এসেছে। ই-আমি লিজের চোখে দেখেছি। শালারা সব্বাই দেখবি,—ঐ নফরার দিকেই দাঁড়াবেক। যা' লয়, তাই ব'ল্‌বেক। কিন্তুক্, হাকিমের কাছে উ-সব বাজিবুজি খাট্‌বেক নাই।···উঠ্, আর দেরী করিস্ না, হাকিমের কাছে আগে লালিশ করে আসি, তা'পর যা হয় হবেক্।"

মহেশও আর উত্তেজিত না হইয়া পারিল না। উৎসাহিত কণ্ঠেই বলিল,—আচ্ছা বলেছিস্। ইয়ের বিহিত না কর্‌লে ঐ নফরার আরও বাড়্ বেড়ে যাবেক্।...থাম্, তামুক সাজি; তামুক খেয়ে যাত্তা ক'রে হাকিমের কাছে যাব।"

'আচ্ছা, আচ্ছা লে, তাই লে।'—কাঙাল আগ্রহের সহিতই বলিল,—"জলদী আগুন আন্,—আমিও অনেকক্ষণ তামুক খাই নাই। বড্ড খিয়াল চেপে গেইছে।"

অতঃপর মহেশ যত শীঘ্র পারিল, তামাক সাজিয়া ফেলিল। তারপর দুই বন্ধুতে যেন পাল্লা দিয়াই হুকায় দম দিতে আরম্ভ করিল; এবং তামাক যখন তাঁহার তামাকত্ব হারাইয়া ভস্মে পরিণত হইল,—তখন উভয়ে "দুগ্‌গা, দুগ্‌গা" বলিতে বলিতে উঠিল!

সহসা ফুলী আসিয়া তাহাদের বাধা দিল; বলিল,—আমি তুমাদের সব কথাই ঐখেনে বসে বসে শুনেছি। না, তুমরা হাকিমের কাছে যেতে পাবে নাই। কেনে, এমন কি হ'য়েছে

যে, হাকিমের কাছকে লালিশ ক'র্‌তে যেতে হবেক্? উ-খালভরা লখীকে সাঙ্গা ক'রেছে, বেশ ক'রেছে; আমি আর উয়োর ঘর ক'র্‌বো নাই। লালিশ করে আর কি হবেক্?"

তাহার কথাবার্ত্তায় ঘৃণা এবং অভিমানের সঙ্গে যেন একটা আত্মমর্য্যাদা-বোধও প্রকাশ পাইতেছিল। নফরা তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া অপর একটা মেয়েকে সাঙ্গা করিয়াছে—ইহাই ত তাহার পক্ষে সে একটা মস্ত বড় অপমানের বিষয় বলিয়া মনে করে;—আবার তাহা লইয়া আন্দোলন করিয়া অপমানের মাত্রাটা বাড়াইয়া তুলিতে সে একেবারেই রাজী ছিল না।

কিন্তু সে তাহাতে রাজী না হইলেও—এবং তাহার প্রতিবাদে মহেশ একটু দমিয়া গেলেও কাঙাল কিছুই শুনিতে চাহিল না। পরুষ কণ্ঠেই সে বলিল,—"তা' বলে এত বড় একটা বজ্জাতী ক'রে নফরা বুক ফুলোয়ে বেড়াবেক,—ই-আমি কিছুতেই সহহ্য ক'র্‌বো নাই। তুই চুপ করে থাক্, ফুলী! ই-নিয়ে তুর মাথা ঘামাবার দরকার নাই। আমরা যা ভাল বুঝ্‌বো, তাই কর্‌বো।"—বলিয়াই সে আর মুহূর্ত্ত-মাত্র দেরী না করিয়া মহেশকে একরূপ টানিয়া লইয়াই বাহির হইয়া পড়িল।

ফুলী সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

হাকিম কমল বাড়ুয্যে মহেশ ও কাঙালের নিকট সমস্ত কথা শুনিয়া প্রথমটা যারপরনাই বিরক্ত হইয়াই বলিলেন,—তোদের জ্বালায় দেখ্‌ছি আমাকে এ-কাজে ইস্তফা দিতে হবে।

বাপ্‌রে বাপ্‌,—কি ঝক্‌মারিতেই না পড়েছি! আজ কারু বৌ ঘর কর্‌ছে না,—কাল কারু বৌ পাড়ার কাউকে নিয়ে পালালো,—পরশু কেউ নিজের বৌ-ছেলে-মেয়ে ছেড়ে,—একটা সাঙ্গা ক'রে বস্‌লো,—এই সব শুন্‌তে শুন্‌তে,—আর এই মাম্‌লার তদ্বির কর্‌তে কর্‌তে—আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত!... যা, যা, আমি পার্‌বো না ও-সবের বিচার কর্‌তে। যা পারিস্‌ তোরা নিজে নিজে কর্‌গে যা।

হাকিমের মূর্ত্তি দেখিয়া মহেশ ত ভড়্‌কাইয়াই গিয়াছিল; কিন্তু কাঙাল বুকে সাহস আনিয়া বলিল,—এজ্ঞে হুজুর, আপুনিই আমাদের রাজা,—আপুনি যদি বিচের করে দোষীকে সাজা না দিবে, তাহালে বদ্‌মাইস লোক জব্দ হবেন কি ক'রে? আপুনি আলগা দিলে ইয়ের পর যা'র যা খুশী, সে তাই কর্‌বেক্‌। কথায় বলে. জাত-বাউরী! শালাদের—লজ্জেও নাই, হায়াও নাই! আর পিত্তিও নাই! ঝাঁটা মেরে শালার জাতের বিষ ঝাড়্‌তে হয়।

কথা শেষ করিয়া—সে বেশ একটু গর্ব্বিতভাবেই মহেশের মুখের দিকে চাহিল। তাহার ধারণা,—সে খুব বিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছে। জাত-বাউরীর সে-ও যে একজন,—এবং গালগুলো যে তাহাকেও লাগিতেছে,—অতশত সে ভাবিয়া দেখে নাই। হাকিম কমল বাবু কিন্তু তাহার এই সরল মূর্খতায় একটু না হাসিয়া পারিলেন না; এবং হাসিতে হাসিতেই বলিলেন,—"তা' ঠিকই ব'লেছিস্‌ কাঙাল! তোদের বাউরীদের প্রায় সব

ঘরেই একটা না একটা ল্যাঠা লেগেই আছে।” পরে মুহূর্ত্তের মধ্যেই বেশ একটু গম্ভীর হইয়া গিয়া বলিলেন,—তা' আমার কাছে আসা মানেই আদালতে আসা, এটা ত বুঝিস্? আদালতে গিয়ে নালিশ কর্‌তে টাকা লাগে জানিস্ ত? তোর ওপর কেউ অত্যাচার করেছে, তুই চাস্ আদালতে বিচার। কিন্তু যতক্ষণ আদালতের খরচ জমা না দিবি, ততক্ষণ ত হাকিম তোর কোন কথা শুন্‌বে না। তাহ'লে আমিই বা বিনি-পয়সায় বিচারে হাত দেব কেন? বেশ কথা. নালিশ কর্‌লি, এখন মামলার খরচ পাঁচ টাকা জমা দিয়ে যা,' আমি ও-বেলা হোক্,—কাল সকালে হোক্, নফরাকে চৌকিদার দিয়ে ডাকিয়ে এর মীমাংসা কর্‌বো।

হাকিমের কথা শুনিয়া মহেশের মামলা করিবার প্রবৃত্তি ত উড়িয়া গেলোই, উপরন্তু কাঙালও তাহাতে দমিয়া না গিয়া পারিল না। নীরবে খানিকক্ষণ নানারূপ চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া সে হাত জোড় করিয়া বলিল,—“এজ্ঞে, হুজুর, আপনার মান্যি অবিশ্যিই কর্‌তে হবেক্। কিন্তুক আপুনি ত জান, আমরা কত গরীব। আপুনি দয়া ক'রে গুটা তুই টাকাই না হয় নিবে। আমি উ-বেলায় এসে দিয়ে যাব।”

ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া কমলবাবু উত্তর দিলেন,—না, না, ও-তে হবেনা। তার চেয়ে মামলা করা বাদ দে। আমার কি গরজ পড়েছে যে, তু'য়েকটা টাকার জন্যে এই সব ছোটলোকের

হাঙ্গামা পোয়াব ? আদালতে গেলে অমন কত পাঁচ টাকা খরচ হ'তো জানিস ?"—বলিয়াই তিনি সেখান হইতে সরিয়া পড়িতে উদ্যত হইলেন।

কিন্তু কাঙালের যেন জিদ্ চাপিয়া গিয়াছিল। বড় মুখ করিয়া বুক ফুলাইয়া নালিশ করিতে আসিয়া, মুখ চূণ করিয়া ফিরিতে তাহার আত্ম-সম্মানে যেন আঘাত লাগিল; সে অত্যন্ত লজ্জা-বোধও করিল। এবং মহূর্ত্তে যেন একটু উত্তেজিত হইয়াই বলিয়া উঠিল,—"আচ্ছা হুজুর, তাই হবেক্। আমি বিকেলে যেমন ক'রে পারি আপনাকে পাঁচ টাকা দিয়ে যাব। তবু 'শালা' নফরাকে আমাকে জব্দ কর্‌তেই হ'বেক। শালার ভারী বাড়্ বেড়েছে !"…মহেশ কিন্তু এ ব্যবস্থা মন দিয়া সমর্থন করিতে পারিল না। অথচ কাঙালের প্রবল জেদের উপর কোন-আপত্তি উত্থাপন করিতেও সে ভয় পাইল।

হাকিম বলিলেন,—বেশ, তবে যা' তোরা এখন। ও-বেলায় টাকা দিয়ে যাবি, তার পর আমি মোকদ্দমা ধর্‌বো।

অতঃপর মহেশ ও কাঙাল সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে কমলবাবু চৌকিদার দিয়া নফরা এবং লখী উভয়কেই ডাকিয়া পাঠাইলেন। অবশ্য তৎপূর্ব্বেই মহেশের প্রতিনিধি কাঙালের নিকট হইতে পাঁচটী নগদ টাকা তাঁহার পকেটস্থ হইয়াছিল।

লখী এখন নফরার ঘরে আসিয়াই ঘরকন্না পাতিয়াছে।…

বেলা আট্‌টার সময় নফরা কাজে যাইবে, ফিরিবে সেই সন্ধ্যায়। কাজের জায়গাও অনেক দূরে। মাঠের কাজ; মাঠের মজুরদের কাজ ছাড়িয়া ঘরে খাইতে আসিবার যো নাই। সেই জন্য যাহারা মাঠে খাটিতে যায়, তাহাদের খাবার বাড়ীর লোককে মাঠেই পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে হয়। কিন্তু অত দূরে নফরার জন্য লখীর ভাত বহিয়া লইয়া যাওয়াও বিশেষ সুবিধাজনক ছিল না। কাজেই খুব সকাল সকাল উঠিয়া ভাত ও একটা তরকারী রাঁধিয়া লখী নফরার জন্য একটা পিতলের গামলায় ভরিয়া ন্যাকড়া দিয়া বাঁধিয়া দিতেছিল। নফরাই তাহা সঙ্গে লইয়া যাইবে এবং যথাসময়ে মাঠে বসিয়াই খাইবে। কিন্তু ঠিক এই সময়েই গ্রামের চৌকিদার পচাই বাউরী আসিয়া জানাইল যে, নফরা এবং ফুলী দুইজনকেই হাকিম তলপ করিয়াছেন, এই দণ্ডেই তাহাদের যাইতে হইবে।

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে গ্রামের ডোম-বাউরী-মুচি প্রভৃতি 'হরিজনগণ' যমের মতই ভয় করিয়া চলে। সুতরাং হাকিমের হুকুম অমান্য করিয়া কাজে চলিয়া যাইতে নফরার একেবারে সাধ্য হইল না। সে তৎক্ষণাৎ লখীকে সঙ্গে করিয়া নানা কথা আলোচনা করিতে করিতে কমলবাবুর বৈঠকখানার সম্মুখস্থ উঠানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অবশ্য চৌকিদার পচাইও তাহাদের সঙ্গে আসিল।

কমলবাবু বৈঠকখানার মধ্যেই ছিলেন। নফরাও লখাকে

আসিতে দেখিয়া ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া তিনি বলিলেন,—বলি, হাঁ-রে নফরা, তুই বিনা-দোষে তোর বিয়ে-করা বৌ ফুলীকে ছেড়ে দিয়ে লখীকে সাঙ্গা কর্‌লি কেন ?···বিনা-দোষে বৌ ছাড়্‌বার আইন নাই, জানিস ? আর ছাড়্‌লেও তার খেসারত দিতে হয়,—সে কথা কি ভুলে গেছিস্ ?

নিতান্ত লখীর মোহে পড়িয়াই নফরা এতদূর অগ্রসর হইয়াছে। কি যে আইন আছে, আর কিসের যে খেসারত দিতে হইবে,—এসব তাহার চিন্তার অনেক বাহিরে। হাকিমের জটিল প্রশ্নের উত্তরে কি বলিতে হইবে, আর কি-ই যে বলা উচিত,—তাহাও সে কোন মতে স্থির করিতে পারিল না। অথচ চুপ করিয়া থাকাও ঠিক নয়।—শেষে অনেক ভাবিয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া নফরা বলিল,—"এজ্ঞে, উয়োর সাথে আমার বনি-বনাও হোতো নাই। উ-ভাল নাই, মন্দ নাই,—মিছে ক'রে আমার উপর কত রকম দোষ চাপাত,—আর তাই নিয়ে হরদম ঝগড়া-ঝাটি কর্‌তো। আমি আর কত সহহ্য কর্‌বো, হুজুর ? তাই শেষকালে উয়োকে ছেড়েই দিলম।"

নিতান্ত মিথ্যা কথাগুলা সাজাইয়া গুছাইয়া বলিতে মোহ-গ্রস্ত নফরার মোটেই বাধিল না। মানুষ যখন পাপে নিমগ্ন হয়, তখন তাহার বিবেকও বুঝিবা ঘুমাইয়া পড়ে !

কমলবাবু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া এইবার লখীকে প্রশ্ন

করিলেন,—আর তুই লখী,—তুই কেন নিজের স্বামী ছেড়ে এসে—নফরা-ফুলীর মাঝে পড়ে এতদূর কর্‌লি ?

"হুজুর, আমার কি দোষ ?" লখী বেশ সপ্রতিভভাবেই উত্তর দিল, "বাপ আমার যার সাথে বিয়া দিয়েছিল, সে খাল্‌ভরা যেন ভূত ! তাকে নিয়ে কে ঘর কর্‌বেক ? তা'পর আমি বাপের কাছে চলে আস্‌তে আমার সোয়ামী আবার বিয়া ক'রেছে; আমাকেও ত ঘরকন্না কর্‌তে হবেক হুজুর ! আর আমাদের বাউরী জাতের যখন ই-সব চলে ; তখন আমি নফরাকে সাঙ্গা করে কি দোষ কর্‌লম, হুজুর ?"

দুই জনের উত্তর পাইয়া হাকিম যেন আর জেরা করিবার পথ পান্ না। কিন্তু তাঁহার যাহা উদ্দেশ্য, তাহা ত সাধন করিতে হইবে ? নচেৎ এসব মামলা হাতে নেওয়াই বা কেন ?

কিছুক্ষণ ভাবিয়া কমলবাবু পুনরায় বলিলেন,—"তোরা দু'জনেই যা বল্‌লি, তার মধ্যে অনেক মিছে কথা আছে,—আমি সব দিকের খবর বেশ ভাল করে না নিয়েই কি তোদের ডেকে পাঠিয়েছি, মনে করিস ? বুঝ্‌লিরে নফরা, আমি সব জানি,—তোর সঙ্গে ফুলীর খুবই বনিবনাও ছিল। তোদের পাড়ার সব্বাই বলেও যে ফুলী ভারী ভাল মেয়ে। তার কোন দোষ নাই। তুই হারামজাদাই যত নষ্টের গোড়া।"—ক্রমশঃই তিনি কণ্ঠস্বর একটু একটু করিয়া চড়াইতে লাগিলেন,—'হঠাৎ লখীর সঙ্গে মিশে, তুই ফুলীর ওপর অনেক অত্যাচার করেছিস ; ফুলী আর সইতে না পেরে বাপের ঘর পালিয়েছে। তারপর—লখীর সঙ্গে

তোর বাড়াবাড়ি দেখে ভয় পেয়ে ভূষণ তোদের সাঙ্গা দিয়েছে। কিন্তু এ ইংরেজ-রাজত্ব ; মগের মুলুক নয় ! এখানে যা খুসী তাই চলবে না ! রাজার হ'য়ে এ তল্লাটে ন্যায়-অন্যায় বিচার করবার ভার আছে আমার ওপর।—আমার বিচারে তুই একের নম্বরের বদ্‌মাস,—মস্ত পাজি ! দাঁড়া, এক্ষুনি তোকে থানায় দারোগা-বাবুর কাছে চালান দিচ্ছি। সেখানে এখন হাজতে পড়ে, কনেষ্টবলদের রুলের গুঁতো খা'বি,—তারপর কয়েদে গিয়ে টান্‌বি ঘানি,—পেঁ-কট্‌-কট্‌ !

হাকিমের মুখে থানার কথা শুনিয়া মুহূর্ত্তে নফরার মুখখানা কাগজের মত শাদা হইয়া গেল। তাহার উপর আবার কনেষ্টবল,—আর তাহাদের রুলের গুঁতো—দারগা, কয়েদ আর ঘানিটানা,—ইত্যাদি কল্পনা করিয়া সে অত্যধিক ভয়ে একেবারে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। এবং সেইখানেই ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িয়া বলিল,—হুজুর মা, বাপ,—আপুনি আমাকে বাঁচাও। কিন্তু লখীকে আমি ছাড়্‌তে লারবো।

কমলবাবু দেখিলেন,—ফল ফলিয়াছে। কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন,—ওঠ্‌ ব্যাটা, ওঠ্‌,—যা করেছিস, করেছিস,—এখন কালকের মধ্যেই আমার কাছে এসে দশ টাকা দণ্ড দিয়ে যাবি। তাহলে আমি সব ব্যাপারই চেপে দেব। তুই লখীকে নিয়ে নির্ভাবনায় ঘর করবি। আর দণ্ড যদি না দিয়ে যাস্‌,—তবে ত বুঝতেই পারছিস !

—শেষের দিকে তিনি একটা ভয়াবহ ইঙ্গিত করিলেন। নফরা আর কি করিবে ?...বিপুল শঙ্কায় কমলবাবুর কথাই মানিয়া লইয়া সে লখীকে লইয়া গৃহে ফিরিল।

নফরার মায়ের রাখিয়া যাওয়া দুই গাছা রূপার বালা, মল ও একটা হাঁসুলি ছিল,—পরদিন সকালে সেগুলো সেকরাদের বিক্রয় করিয়া বহু কষ্টে দশ টাকা যোগাড় করিয়া সে হাকিমের নিকট দণ্ড দিয়া আসিল।

ইহার পর আবার মহেশকে সঙ্গে করিয়া কাঙাল যখন বিচারের ফলাফল জানিবার জন্য কমলবাবুর নিকট আসিল,—তখন তাহাদের দেখিয়াই কমলবাবু গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—যা, যা, দূর হ এখান থেকে। যেমন সব ছোটলোক,—তেমনি সব কাণ্ড ! ফুলী ত নিজেই নফরার ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। তবেই ত নফরা সাঙ্গা করেছে ! স্বামী-স্ত্রীতে অমন ঝগড়াঝাটি কত হয়, তা' ব'লে কে কোথায় স্বামীর ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় ? এর মধ্যে আগাগোড়া দেখছি ফুলীরই দোষ। যা, যা, তোদের মামলা ডিস্‌মিস্ হয়ে গেছে।"—বলিয়াই তিনি কৃত্রিম ক্রুদ্ধ ভাব দেখাইয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে উঠিয়া পড়িলেন।

মহেশ এবং কাঙাল উভয়েই হতভম্ব হইয়া এ-উহার পানে চাহিয়া রহিল !...

দিন কয়েক পরে একটা ভারী শোচনীয় ব্যাপার ঘটিয়া গেল !

কতদিনের পুরাতন বটগাছ তাহা গ্রামবাসীদের কেহই ঠাহর করিতে পারে না! গ্রামের অতি বৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া বড়-ছোট সকলেই বলে, 'গাছটাকে চিরকাল এইরূপই দেখিতেছি।' প্রকাণ্ড গাছ! চতুর্দ্দিকে প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাত পর্য্যন্ত শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বিরাট বনস্পতির ন্যায় গ্রামের দক্ষিণ মাথায় দাঁড়াইয়া আছে,—যেন অনন্ত কালের এক অতি বিশ্বস্ত, নির্ম্মম অথচ করুণ সাক্ষী! যেমন বৃদ্ধ, তেমনি সৌম্য, আবার তেমনি দৃঢ়! কত উত্থান, পতন, ধ্বংস ও সৃষ্টির ইতিহাস যেন ঐ বয়োবৃদ্ধ বৃক্ষের কোটরে কোটরে, অগনিত কালো পত্রের মর্ম্মরে মর্ম্মরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে!

বহু পুরাতন বটগাছ; সুতরাং চারিদিকে অসংখ্য ঝুরি নামিয়া একেবারে মাটী স্পর্শ করিয়াছে। এক একটা ঝুরি, তেমন তেমন এক একটা গাছের কাণ্ডের মতই মোটা। গ্রীষ্মের স্তব্ধ-অলস মধ্যাহ্নে রাখাল বালকগণ অদূরের মাঠে গরু-ছাগল-মেষ-মহিষ প্রভৃতির পাল ছাড়িয়া দিয়া অতিথি-সেবক তরুবরের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লয়। কেহ বা বসিয়া বসিয়া গান করে, কেহ বা গামছা পাতিয়া শোয়; আর মাঝে মাঝে 'হেই, হোই, অ্যায় শিঙ-ভাঙা, ধলা, শামলা, ঘুরে আয় বলছি', ইত্যাদি নানারূপ চীৎকার করিয়া গরু-বাছুরের দলকে এদিক-সেদিক চলিয়া না যাইবার জন্য সাবধান করে। এবং আরও একটা কাজ, যাহা তাহারা প্রায়ই করে, তাহা যেমন তাহাদের প্রিয়, আবার তেমনি আমোদজনক! অর্থাৎ গাছের কোন কোন ঝুরির

আগায় বেশ শক্ত করিয়া লাঠি বাঁধিয়া তাহার উপর ঘোড়া-চাপা হইয়া বসিয়া তাহারা একে একে দোল খায়। একজন আর একজনকে দোলাইয়া দেয়। এইরূপভাবে পরস্পর পালা করিয়া, তাহারা দ্বাপরের ঝুলন-যাত্রা-উৎসবেরই যেন পুনঃ-প্রবর্ত্তন করে।

বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে ; নফরা মজুর খাটিয়া ঘরে ফিরিতেছিল, সঙ্গে ছিল লখী। অবশ্য পথের মাঝে একবার পচুই মদের দোকানে ঢুকিয়া তাহারা কর্ম্ম-ক্লান্তিটুকু দূর করিয়া ফেলিয়াছিল। একটু একটু গোলাপী নেশা দুইজনেরই লাগিয়াছে। বটগাছটার নিকটে আসিতেই নফরা নেশার ঝোঁকে হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—দুল্‌বি লখী !

'হঁ, দুল্‌ব।'—লখা সোৎসাহেই বলিয়া উঠিল।

নফরা হাসিতে হাসিতে বলিল,—'তাহালে তুই আগে, তা'পর আমি।' বলিয়াই সে মাথার গামছা দিয়া হাতের মোটা লাঠি-গাছটা একটা ঝুরির আগায় বাঁধিয়া ফেলিল।—"লে চাপ্,"—লখীর দিকে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়াই সে বলিল,—"কিন্তুক বস্‌বি বেশ ভাল করে।"

লখী প্রথমটা কেমন একটু লজ্জিত হইল,—কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই লজ্জা-সঙ্কোচ ঝাড়িয়া ফেলিয়া লাঠিটার উপর ঘোড়া-চাপা হইয়া বসিয়া পড়িল।

"হেইলেস্তা"—বলিয়া নফরা লখীকে প্রবলভাবেই দোলাইয়া

দিল। লখী খানিকটা উপরে উঠিয়া আবার নামিয়া আসিল; বলিল,—অত জোরে দিস্ না; নফরা, আমার ডর লাগছে!

নফরা বলিল,—আচ্ছা, আস্তে-আস্তেই দিছি।—বলিয়া সে লখীকে দোলাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে লখী নামিল,—নফরা উঠিয়া লাঠিটার উপর বসিল। বসিয়াই বলিল,—'যত জোরে তুই পারিস, লখী, আমি ত আর তুর মতন ডর খাব নাই!'

'ইস্, ভারী মরদ!'—একটা কটাক্ষ হানিয়া লখী সত্যসত্যই যত জোরে পারিল, নফরাকে দোলাইয়া দিল।

"আরও জোরে।"—নফরা চীৎকার করিয়া উঠিল,—'বাঃ, বাঃ, কি মজারে লখী, টান মেরে হোই পয্যন্ত নিয়ে যেয়ে, দে ছেড়ে!'

লখী তাহাই করিল।

নফরার যেন দোল খাইবার নেশা চাপিয়া গিয়াছে। আর লখীও তাহাকে দোলাইতেছে একেবারে যেন মত্ত হইয়াই।

কিন্তু বহুদিন যাবৎ প্রবল দোলনের ধাক্কা সহিয়া সহিয়া এই ঝুরিটার শক্তি যেন অনেক কমিয়া আসিয়াছিল; তদুপরি নফরার অতি মাত্রায় দোলনের বেগ তাহাতে বুঝি আর সহিল না। ঝুরিটা হঠাৎ পড়্ পড়্ করিয়া গাছের শাখা হইতে ছাড়িয়া গেল; আর সঙ্গে সঙ্গে নফরা সেই ঝুরি-সমেত লাঠির উপর সেই ঘোড়া-চাপা অবস্থাতেই একেবারে পঞ্চাশ-ষাট হাত দূরে

ছিটাইয়া পড়িল, এবং মুহূর্ত্তেই দারুণ আঘাতে একেবারে অজ্ঞান হইয়া গেল!

লখী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়া নফরার দিকে ছুটিল। ভাগ্যক্রমে তখন ঐ রাস্তা দিয়া দুইতিন জন লোক কোথায় যাইতেছিল। তাহারাও শশব্যস্তে সেখানে ছুটিয়া আসিল।

লোকগুলির কথামত লখী সেই স্থানে পতিত একটা নোংরা মাটির হাঁড়ি তুলিয়া লইয়া, তাহাতে করিয়াই নিকটবর্ত্তী জলাশয় হইতে জল লইয়া আসিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া নফরার চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে দিতে তাহার জ্ঞান একটু ফিরিয়া আসিল। তখন লোকগুলি লখীর অনুরোধে ধরাধরি করিয়া নফরাকে তুলিয়া কোনরূপে ভূষণের গৃহে পৌঁছাইয়া দিল।

সংবাদটা ফুলীর কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইল না। যে তাহাকে সংবাদ দিল, সে জানাইল যে,—গুরুতর আঘাতের ফলে নফরার ডান হাত এবং বাঁ পা একেবারে জখম হইয়া গেছে। তাহার নাকটা ভীষণভাবেই ছেঁচা গিয়াছে,—এবং ছোটখাট চোট্ যে কত লাগিয়াছে,—তাহা ঠিক বোঝা যায় না। মোট কথা, জীবন তাহার সঙ্কটাপন্ন!

কথাগুলা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই ফুলীর মুখখানা একেবারে শাদা হইয়া গেল,—তাহার অন্তর ডুকুরিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—হায়, হায়,—তবে কি নফরা বাঁচিবে না!

কিন্তু যে সংবাদটা বহিয়া আনিয়াছিল,—তাহার কাছে অন্তরের ভাবটা গোপন করিবার জন্য ফুলী মুহূর্ত্তে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইল এবং বাহিরে যথাসাধ্য দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়া বলিল,—উ, খাল্‌ভরার কপালে এখনো আরও যে কত আছে, তা' ইয়ের পর দেখ্‌বি। হবেক নাই?—ভগমান কি মরে গেইছে! কত্তালের মতন চোখ নিয়ে হোই আগাশ থেকে সব দেখ্‌ছে। অত খপ্‌ ক'রে উ মরবেক নাই, অনেক কষ্ট পেয়ে মর্‌বেক।

কিন্তু যেই লোকটা সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল, অমনি ফুলীর চোখে যেন শ্রাবণের ধারা নামিয়া আসিল। তাহার মনে হইল, তৎক্ষণাৎ নফরার কাছে ছুটিয়া গিয়া তাহার ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিবে; যেমন করিয়াই হোক,—তাহার ব্যথা লাঘব করিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু একে ভূষণের ঘর, তাহার উপর লখী নফরাকে আগলাইয়া আছে। সুতরাং ফুলীর প্রাণের ভিতরটা আকুলি বিকুলি করিয়া উঠিলেও—সে অগ্রসর হইতে পারিল না।

কিন্তু ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া থাকাও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল! কোথায় যাইবে, কি করিলে নফরার মঙ্গল হইবে,—অস্থির চিত্তে এই সব ভাবিতে ভাবিতে সে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। পাড়ার একটা মেয়ে তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল,—এই যে ফুলী, নফরার খবর জানিস্‌?

হুঁ—বলিয়াই ফুলী তাহাকে পাশ কাটাইয়া গেল।.. একটু আগেই ক্ষেপা কালীর মন্দির। ফুলী মন্দিরের চত্বরে মাথা

ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল,—হে-মা ক্ষেপাকালী, নফরাকে ভাল করে দাও মা, আমি তুমাকে যোড়া পাঁঠা দিব। নফরা আমাকে যাই করুক,—তবু ত উ আমার সোয়ামী মা,—উয়োকে ভাল করে দাও; তুমার কিপ্যেয় উয়োর মতলব যেন ভাল হয়!”

প্রার্থনা শেষ করিয়া ফুলী যখন মুখ তুলিল,—তখন তাহার কপাল লাল হইয়া উঠিয়াছে,—চোখের জলে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতেছে। কিন্তু মা-কালীর কাছে প্রার্থনা জানাইয়াও সে খুব নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। তৎক্ষণাৎ সেই পথেই বাবা বুড়ো শিবের মন্দিরের দিকে ছুটিল।

গ্রামের উত্তর-পশ্চিম কোণে বুড়ো শিবের মন্দির। বাবা নাকি মহাজাগ্রত; এবং কাহারো প্রতিষ্ঠা করা নহেন। চারিদিকের মাটি ফাটাইয়া বাবা নাকি নিজ হইতেই মাথা চাড়া দিয়া উপরে উঠিয়াছেন! প্রথম প্রথম বাবার মাথা নাকি আকাশ স্পর্শ করিত; এবং পূজারী ঠাকুরকে নিকটবর্ত্তী একটা বেলগাছের উপর উঠিয়া বাবার মাথায় ফুল-বেলপাতা দিতে হইত। একদিন পূজারী ঠাকুর বড় দুঃখ করিয়াই বাবার কাছে বলিয়াছিলেন,—বাবা, আমি বুড়ো মানুষ, রোজ রোজ গাছে উঠে আপনার পূজো করতে আমার ভারী কষ্ট হচ্ছে! কোন্ দিন হয়ত এই বুড়ো বয়সে গাছ থেকে পড়ে হাত-পা ভেঙ্গে যাবে! বাবা, এর বিহিত আপনি না করলে—

উচ্ছ্বসিত ভক্তির প্রাবল্যে পূজারী ঠাকুর আর বলিতে পারেন নাই। কিন্তু না পারিলেও ভক্ত-বৎসল অন্তর্য্যামী

বাবার আর কিছু বুঝিতে বাকী ছিল না ;—এবং পরের দিনই পূজারী ঠাকুর পূজা করিতে গিয়া বিপুল বিস্ময়ে দেখিলেন,—তালগাছ-প্রমাণ বাবা একেবারে আড়াই হাত ছোট হইয়া গিয়াছেন ! বাবার এই মাহাত্ম্যে সেদিন সারা গ্রামে একেবারে হলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল।

—এবং আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও নাকি বাবার কাছে কোন-কিছু মানত করিয়া নিরাশ হইতে হয় নাই। প্রতি বৎসর চৈত্র-সংক্রান্তিতে মহা ধূমধামের সহিতই বাবার গাজন হয়।

বাবার মন্দিরের অনতিদূরে একটি পুষ্করিণী। নাম 'শিব-পুকুর।' এই পুকুরের জলেই বাবার পূজার সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাহারা বাবার কাছে ধর্ণা বা হত্যা দেয়,—তাহাদিগকে পূর্ব্বে এই পুকুরের জলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়।

ফুলী যথাসম্ভব ক্ষিপ্রপদে মন্দির-পাশের সরাণ রাস্তা ধরিয়া শিব পুকুরের পূর্ব্ব দিকের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। পুকুরটার তরঙ্গায়িত কালো জলে রাশি রাশি পদ্ম, শালুক ও কুমুদ ফুটিয়া চমৎকার শোভা বিস্তার করিতেছে। তাহার মধ্যে মধ্যে লাল রঙের পাণিফলের লতা লতাইয়া লতাইয়া সারা পুকুরটাই যেন ছাইয়া ফেলিয়াছে। পদ্মবনে কয়েকটা ডাহুক-ডাহুকী আনন্দে মাতামাতি স্বরু করিয়াছে। ও-ধারে আবার দুই-তিনটা পানকৌড়ি একবার ডুবিতেছে,—আবার উঠিতেছে,—যেন ডোবা আর ওঠাই তাদের কাজ। একজন জেলে টানা

জালে পুকুরের ধারে ধারে ছোট ছোট মাছ ধরিয়া বেড়াইতেছিল। ভুবন জলে একজন একটা বংশদণ্ডের দুই দিকে দুইটা হাঁড়ি বাঁধিয়া বাঁশটার উপর ভর করিয়া পানিফল তুলিতেছিল।

ফুলী একবার চঞ্চল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া টপ্ করিয়া একটা ডুব দিয়া মন্দির-প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইল;—এবং সেখানে হত্যা দিয়া পড়িয়া বলিল,—বাবা, তুমার কাছকে যে এসেছে, তারই আশা মিটেছে। নফরাকে তুমি ভাল ক'রে দাও বাবা,—আমি গাজনের সময় তুমাকে রূপোর পৈতে, রূপোর গাঁজার ক'ল্‌কে দিব। আর তুমার 'উপোস' ক'র্‌বো। নফরার অপ্‌রাদ্ লিয়োনা বাবা, ঐ লখী ছুঁড়িই উয়োর মাথা খেয়েছে!' বলিতে বলিতে তাহার চোখ দুইটি দিয়া আবার জল ঝরিয়া পড়িল।

প্রার্থনা জানাইয়া উঠিতেই ফুলী দেখিল,—অদূরে কুসুমী গোয়ালিনী দাঁড়াইয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেছে। কুসুমী জিজ্ঞাসা করিল,—'বুড়ো শিবের কাছে কিসের মানত কর্‌লি লো ফুলী?'... ফুলী বলিল,—'এই নফরা খাল্‌ভরাকে যেন আর উঠ্‌তে না হয়,—বাবাকে সেই কথাই ব'ল্‌লম।'

কুসুমী আবার মুচ্‌কি হাসিয়া চলিয়া গেল। কথাটা বলিয়া ফেলিতেই ফুলীর বুকটা কিন্তু কাঁপিয়া উঠিল,—তাহার মনে ধিক্কার জন্মিল,—ছিঃ ছিঃ, অমন অলুক্ষণে কথা কেনে ব'ল্‌লম। সে মন্দিরের দিকে আবার চাহিয়া বলিল,—কুসুমীকে আমি মিছে কথা ব'লেছি বাবা। নফরাকে তুমি বাঁচাও।...

বাবার মাহাত্ম্যেই হোক্, আর নফরার বরাত জোরেই হোক—সে কিন্তু দিনের পর দিন আরোগ্যের পথেই অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার আঘাত যতটা গুরুতর হইয়াছে, ভাবা গিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে ততটা হয় নাই। ভূষণ নানাপ্রকার গাছগাছড়া এবং টোট্‌কা ঔষধের কথা জানিত। তাহার চিকিৎসা-বিদ্যাই সে নফরার উপর প্রয়োগ করিল। লখীও নফরার যথোচিত সেবা-শুশ্রূষা করিতে কুণ্ঠিত হইল না। যাই হোক, দেড় দুই মাস পরেই নফরাকে আবার বেশ সুস্থ ও সমর্থ শরীরে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে দেখা গেল।

ফুলী গোপনে গোপনে প্রায়ই নফরার খবর রাখিত। নফরাকে সুস্থ হইতে দেখিয়াই সে অসীম ভক্তিভরে বুড়া শিবের উদ্দেশে প্রণাম করিল এবং সেই দিনই তাহার রূপোর পৈঁছেটা লইয়া বাবার পৈতে ও গাঁজার ক'ল্‌কে গড়িতে দিবার অভিপ্রায়ে গোবিন্দ স্বর্ণকারের নিকট ছুটিল।

* * * *

নফরার সঙ্গে ফুলীর ছাড়াছাড়ি হইয়া যাওয়ায় একজন কিন্তু আশা-ভরসায় উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে পাড়ার মিতন বাউরীর ছেলে বাঁকা। ফুলীকে বিবাহ করিবার জন্য যাহারা বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিল—কিন্তু মহেশের পণের দাবী মিটাইবার অক্ষমতায় মনের আশা মিটাইতে পারে নাই;—তাহাদের মধ্যে বাঁকাই ছিল অগ্রণী। চার বৎসর পূর্ব্বে বাঁকার অবশ্য পাশের গাঁয়ের একটা এগার বছরের মেয়ের

সহিত বিবাহ হইয়াছিল,—কিন্তু বাঁকার তাহা বিবাহ বলিয়াই মনে হয় নাই। কারণ একে মেয়েটার বয়স ছিল কম, তার উপর সে বেশ হৃষ্টপুষ্টও ছিল না। তবু আজ চার বৎসর পরে তাহার বয়স হইত পনর,—এবং তাহার দেহে একটু মাংস লাগিতেও পারিত।—ফলে আজ তাহাকে লইয়াই বাঁকার হয়ত সংসার পাতা চলিত,—এবং বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে দেহে মাংস লাগিলে,—এবং যৌবনের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইলে তাহার দিকে চাহিয়া বাঁকার হয়ত তাহাকে অপছন্দও হইত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় মেয়েটার বা বাঁকার অদৃষ্টে সে-সব যোগ ছিল না। বিবাহের নয় মাস পরেই সে বাঁকাকে খালাস দিয়া পরপারে প্রস্থান করিয়াছে।—

এবং তাহার পর বাঁকার আর বিবাহ হয় নাই। আর হয় নাই বলিয়াই এখন তাহার বহুপূর্ব্বে প্রার্থিত ফুলীকে যদি সে পায়,—তবে সে-যে কৃতার্থ হইয়া যাইবে,—সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? তাহার ধারণা, ফুলীকে লাভ করা বর্ত্তমানে তাহার পক্ষে সুকঠিন না-ও হইতে পারে। যেহেতু, এই কাঁচা বয়স হইতে বাউরী-ঘরের মেয়ে ফুলী স্বামী ছাড়িয়া যে সঙ্গিহীন জীবন কাটাইয়া দিবে,—তাহা যেমন অসম্ভব, তেমনি অস্বাভাবিক। আর যাহা সম্ভব বা স্বাভাবিক,—তাহা বাঁকার সহিত সম্ভব হইতেই বা বাধা কোথায় ?

র কথা ভাবিতে ভাবিতে বাঁকা ক্রমশঃই চঞ্চল হইয়া

উঠিল। এবং আর স্থির থাকিতে না পারিয়া একদিন সুযোগ বুঝিয়া মহেশের সহিত দেখাই করিয়া ফেলিল।

মহেশ তাহার ঘরের উঠানের আঁজীর গাছের * তলায় বসিয়া তামাক টানিতেছিল। বাঁকাকে দেখিয়াই সে অভ্যর্থনা করিল, "বাঁকা যে, আয়, ব'স্, এই গাছ-তলাতেই ব'স্।

বাঁকা কিছু না বলিয়াই নিতান্ত শিষ্টের মত আদেশ পালন করিল। হুঁকাটা তাহার হাতে দিয়া মহেশ বলিল,—লে, তামুক খা'। আজ খাট্‌তে যাস্ নাই নাকি?

ফুড়ৎ, ফুড়ৎ করিয়া হুঁকায় দু'একটা টান দিয়া বাঁকা উত্তর দিল,—'আজ কুথাও খাটালী নাই হে, তাই তুর সাথে একবার দেখা ক'র্‌তে এলম। ক'দিনই ভাবছিলম, আস্‌বো; কিন্তুক ফুরসুৎ পাই নাই।'...মহেশ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বাঁকার মুখের দিকে চাহিল;—জিজ্ঞাসা করিল,—"কেনে, কি দরকার আছে বল্ ত?"

এদিক সেদিক একবার চাহিয়া, দুই একটা ঢোক-ও গিলিয়া এবং মহেশের দিকে আর একটু সরিয়া বসিয়া বাঁকা কোনরূপে বলিয়া ফেলিল,—তা হেঁ-হে, নফরা শালা ত ফুলীকে ছেড়েই দিলেক। সেই পাপে শালা ত বটগাছের ঝুরি ছিঁড়ে মরতেই ব'সেছিল; বহুৎ পেরমাইএর জোর, তাই বেঁচে গেল! তা ফুলীর ত আবার একটা হিল্লে ক'রে দিতে হবেক হে! নইলে ফুলীকে নিয়ে তুরই ত হবেক যত 'ধস্তানী'।

* আঁজীর—আঞ্জীর, পেয়ারাজাতীয় ফল।

মহেশও আজ দুই তিন দিন ধরিয়া এই কথাটাই ভাবিতেছিল। নফরা যখন ফুলীকে ছাড়িয়াই দিয়াছে,—আর শুধু তাই নয়,—লখীকে সাঙ্গা করিয়া তাহার সহিত ঘরকন্না করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে,—তখন ফুলীরও ত আবার একটা স্বামী জুটাইয়া দেওয়া প্রয়োজন! নচেৎ চিরকাল ধরিয়া তাহাকে ভরণ-পোষণ করিবে কে? আর ভরণ-পোষণের কথা বাদ দিলেও এই পরিপূর্ণ যৌবনে স্বামী ছাড়িয়া সে কয়দিন নিজেকে ঠিক রাখিতে পারিবে? ফুলীর বয়সী মেয়ের পক্ষে প্রবৃত্তির উত্তেজনা দমন করিয়া সংযতভাবে থাকা কি সম্ভব? না,—বাউরী-ঘরে জন্মিয়া মহেশ কোন দিন সে আদর্শ দেখে নাই। এমন কি ভদ্রঘরের সম্বন্ধেও এ-বিষয়ে তাহার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাহার বিশ্বাস,—মেয়েমানুষ, বয়স কাঁচা,—তা' সে বাউরী ঘরেরই হোক,—আর ভদ্র ঘরেরই হোক,—'স্বামী-সঙ্গ' না পাইলে নিশ্চয়ই কুপথে পা দিবে। দু'য়ের মধ্যে তফাৎ এই যে,—ভদ্রলোকেরা ভিতরে ভিতরে বহু পাপ গোপন করিয়া বাহিরে সমাজের আদর্শ রক্ষা করিয়া চলেন;—মানে তাঁহাদের অনেক কিছুই গুপ্ত থাকে;—আর ডোম-বাউরীদের ঘরে—সমস্তই খোলাখুলি প্রকাশ হইয়া পড়ে!—কারণ তাহারা মুখোস পরিতে জানে না; তাহাদের অ-শিক্ষা, অসভ্যতা এবং অমার্জ্জিত বুদ্ধি কোন দিন তাহাদিগকে তাহা করিবার মত কলা-কৌশলও শিখাইয়া দেয় নাই। আর সেই জন্যই বুঝি তাহারা হইয়াছে অ-ভদ্র—ছোটলোক।

সে যাহাই হোক্—এ-ক্ষেত্রে ফুলীর আবার বিবাহ দেওয়াই যে, সবদিক দিয়া মঙ্গল,—তাহা মহেশ ভালরূপেই বুঝিয়াছিল। তবে ফুলীর হাবভাব দেখিয়া সে তাহার নিকট এ-বিষয়ে কোন কথা উত্থাপন করিতে পারে নাই। বাঁকার প্রস্তাবে সে যেন কিছু উৎসাহ পাইয়াই বলিল,—"আমার ত তাতে কিছু ওজর-আপত্তি নাই রে বাঁকা,—তবে ফুলীর মতলব কিছু বুঝ্‌তে লার্‌ছি। আমিত বুঝে দেখ্‌ছি, নফরা যখন অমন ক'র্‌লেকই, তখন ফুলীর সাঙ্গা দিতেই হবেক। তাতে ফুলীরও ভাল হবেক, আর নফরাও বুঝবেক যে,—হঁ, উয়োদের ট্যাঁক আছে।"

"নফরাকে ত সে কথা বুঝোতেই হবেক হে।"—হাতে একটা তালি দিয়া বাঁকা বলিয়া উঠিল,—'ইয়ের আর ভাবাভাবি কি,—আর ফুলীর মতলবই বা কি? তুই হলি ফুলীর বাপ,—তুই যা' করবি, তার উপরে কথা কইবেক কে? তা' আমি ব'ল্‌ছিলম কি,—বলি, আমাকেও ত ঘর-সংসার পাত্‌তে হবেক; তা ফুলীর সাঙ্গা আমার সাথেই দে কেন্‌নে?"

বাঁকার প্রস্তাবের শেষ কোথায়, তাহা মহেশ পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিল। অবশ্য বাঁকার সহিত ফুলীর সাঙ্গা দিতে তাহার কোন আপত্তিও ছিল না। সে বরাবরই জানে, বাঁকা ফুলীকে ভালবাসে।...তাহা ছাড়া, বাঁকার খাটিবার শক্তি আছে। খাটিয়া-খুটিয়া ফুলীকে সে সুখেই রাখিতে পারিবে। সর্ব্বতোপরি, বাঁকার স্বভাব-চরিত্রের উপর মহেশের যথেষ্ট

আস্থা ছিল। বাঁকা যখন নিজে উপযাচক হইয়া ফুলীকে সাঙ্গা করিতে চাহিতেছে,—তখন সে সুযোগ ছাড়িয়া দেওয়া যে উচিত নয়, ইহাও বুঝিতে মহেশের বাকী থাকিল না। কিন্তু তবুও সে পূর্ণ সম্মতি দিতে পারিল না। চিন্তিতভাবেই বলিল,—"সে ত খুব ভাল কথা রে বাঁকা। তবে ঐ যে বললম, ফুলীর হাবভাব দেখে উয়োর মতলব কিছু বুঝতে লার্‌ছি। আজকাল সারাক্ষণই মুখ ভার ক'রে থাকে। কিছু বল্‌তে পয্যন্ত আমার সাহস হয় না। তা, তুই নিজেই উয়োকে এক-বার ব'লে দেখ্‌ কেন্‌নে, কি জবাব দেয়? উ-যদি রাজী হয়, আমিও রাজী আছি।"

মহেশের সম্মতি পাইয়া বাঁকার হৃদয়ে যেন আনন্দের বান ডাকিয়া গেল। যেহেতু তাহার ধারণা,—মহেশের যখন মত আছে, তখন ফুলীকে রাজী করিয়া ফেলিতে তাহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। সে দুই-চার কথাতেই ফুলীর মন টলাইয়া দিবে। হাসি-হাসি মুখে সে উত্তর করিল,—"তবে আর ভাবনা কি হে? তুর যখন মত আছে, তখন ধর্‌ উ হ'য়েই গেইছে। আমি কালই ফুলীকে কথাটা ব'লে সব ঠিক্‌ঠাক্‌ ক'রে ফেল্‌বো।"

"বেশ, তাই করিস্‌,"—মহেশ আগ্রহের সহিতই বলিল,—"ফুলী রাজী হ'লে, কাজ সেরে ফেল্‌তে আমি পাঁচদিনও বিলম্‌ কর্‌বো নাই!"

আর কিছু না বলিয়া বাঁকা সেখান হইতে উঠিয়া পড়িল;

এবং রাস্তায় নামিয়া মনের আনন্দে শিস্ দিতে দিতে তাহাদের ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

বাউরী পাড়ার খুব নিকটেই একটি বৃহৎ সুগভীর পুষ্করিণী,—নাম 'ময়রা-দীঘি'। দত্ত ওরফে মোদকদের পুকুর বলিয়াই অপভ্রংশে ঐ নাম হইয়াছে। ময়রা-দীঘির চারি পাড়েই ঘন তালবন। পাড়গুলি বেশ উঁচু উঁচু। ময়রা-দীঘির জল নির্ম্মল, সুশীতল এবং সুপেয়ও বটে। শালুক, পদ্ম, কলমী, পেনেড়ী প্রভৃতি জলজ লতা তাহার বুকে একেবারেই নাই। কিন্তু গ্রামের কোন্ এক টেরে বাউরী-পাড়ার নিকট অবস্থিত বলিয়াই ভদ্র-লোকেরা অথবা তাহাদের বাড়ীর মেয়েরা ময়রা-দীঘিতে বড় একটা আসে না। কাজেই ডোম-বাউরী-মুচি প্রভৃতি জাতি অবাধে এবং অশেষ-বিশেষে ময়রা-দীঘিকে তাহাদের ব্যবহারে লাগাইয়া ফেলিয়াছে। ময়রা-দীঘিও গ্রামের ভদ্রসমাজের উপেক্ষিত; আর ডোম-বাউরীরাও তাই; কাজেই দুই পক্ষই সমান ব্যথায় ব্যথিত,—এবং উভয়ে উভয়কে ব্যথার ব্যথীরূপে পাইয়া সকল বেদনা ভুলিয়া যেন ভদ্রসমাজকে ব্যঙ্গ করিতেছে!

বেলা তখন প্রায় পাঁচটা,—ময়রা-দীঘিতে গা ধুইয়া কাপড় কাচিয়া, মাটির কলসী ভরিয়া জল লইয়া ধীরে ধীরে ফুলী পাড়ে আসিয়া দাঁড়াইল। কাঁখের কলসীটা পাড়ে নামাইয়া গা-মোছা ন্যাকড়াটা চুলের সহিত দড়ির মত করিয়া জড়াইয়া সে চুলগুলির জল নিংড়াইয়া ফেলিল। তারপর চুলগুলি বারবার ঝাড়িয়া

এলো করিয়া পিঠের দিকে ফেলিয়া দিয়া কলসীটাকে যেমনই আবার কাঁখে তুলিয়াছে, অমনি কোথা হইতে বাঁকা আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইল। তাহার পরিধানে একখানি নয় হাত সাবানে কাচা ধুতি,—কাঁধে একটি লাল রঙের নূতন গামছা—ট্যাঁকে এক বাণ্ডিল বিড়ি ও একটা দেশালাই। মাথার চুলগুলি তেলে একরূপ ভিজাইয়া লইয়াই সে লম্বা সিঁথি করিয়া ঢেউতোলা টেরী কাটিয়াছে। তাহার কপালে এবং দুই কানের পাশে মাথার তেল গড়াইয়াও পড়িতেছে! ফুলীর সামনে আসিয়াই সে ট্যাঁক হইতে বিড়ি-দেশালাই বাহির করিয়া একটা বিড়ি ধরাইল। এবং খুব জোরে একটা টান দিয়া হুস্ করিয়া কতকটা ধোঁয়া ফুলীর মুখের দিকেই ছাড়িয়া দিয়া বলিল,—গা ধুতে এসেছিলি না-কি ফুলী! পরশু যে তুর বাপের কাছে গেইছিলম।

বেশ ফিট্‌ফাট্ হইয়া বাঁকা কি জন্য ময়রা-দিঘীর পাড়ে নির্জ্জনে যাচিয়া আলাপ করিতে আসিয়াছে, ফুলী যেন তাহা কিছু কিছু বুঝিতে পারিল। বাঁকার দিকে একটা বাঁকা চাহনি নিক্ষেপ করিয়া সে বলিল,—তা' গেইছিলি, বেশ ত করেছিলি,—তার আবার আমাকে বলছিস্ কি?

"তুখে বলুব নাই ত আর কাখে বলব?"—ভাবের হাসি হাসিয়া বাঁকা জবাব দিল,—"বলি, তুর লেগেই ত গেইছিলম।"—তারপর একটু রসিকতা করিয়াই বলিল,—মাইরি বলছি ফুলী, তুখে আমি ভুলতে লার্‌ছি। তুই আমার 'মন-পান' কেড়ে

নিয়েছিস্ ! তা নফরা শালা ত আর তুর 'মহিমে' বুঝতে লার্লেক ; শালা লখীকে পেয়েই মজে গেল ! কিন্তুক তুরও ত একজন চাই ? তা—তা—আমাকেই সাঙ্গা কর্ কেন্নে ?... কেনে, আমাকে কি তুর মনে লাগে না ?—বলিতে বলিতে সে মাথার টেরীটা ঠিক আছে কিনা, তাহা একবার হাত বুলাইয়া দেখিয়া লইল। বুকের ভিতরটাও তখন তাহার আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দুলিয়া উঠিতেছিল !

ফুলী একটা তীব্র কটাক্ষ হানিয়া উত্তর দিল,—"এই জন্যেই বুঝি, এ্যাদ্দূর ছুটে এসেছিস ? ছাড়্, ছাড়্, পথ ছাড়্, উ-সব কথা এখন আমার ভাল লাগছে নাই।" সে বাঁকাকে এড়াইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। বাঁকা ব্যাকুলভাবে তাহার পথ-রোধ করিয়া দারুণ আকুলতার সহিত বলিল,—দাঁড়া, দাঁড়া, শুন্ ; আমি ভাল কথাই বলছি। তুর বাপ বল্লেক্—"

তাহার রকম দেখিয়া ফুলী হঠাৎ ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল—"বাপ কি বল্লেক রে খাল্ভরা ? মর্তে বুঝি আর জায়গা পাস্ নাই তুই !"

"মরি ত তুর কুলেই মাথা রেখে মর্ব ফুলী ?"—যেন খুব ভাবপূর্ণ একটা ভাল কথাই বলিতে পারিয়াছে,—এইভাবে চোখ দুইটা উজ্জ্বল করিয়া বাঁকা ফুলীর মুখের দিকে চাহিল। পরে আগেকার কথাটার উপর জোর দিয়াই বলিল,—"ই তুখে বলে রাখ্লম ;—দেখে লিস্ তুই ইয়ের পর।...তুর বাপের ত একদম আপত্তি নাই ; বরং আমার কথা শুনে আহ্লাদে একেবারে

আটখানা হয়ে গেল। বল্‌লেক,—ই-আর তুই আমাকে কি শুধোছিস্ বাঁকা,—ফুলী রাজী হলে আমি পাঁচদিনের মধ্যেই তুদের সাঙ্গা দিয়ে দিব।"

"কিন্তুক আমি ত সাঙ্গা করবো নাই বাঁকা।"—ফুলীর কথার মধ্যে এবার যেন একটা ব্যথার সুরই বাজিয়া উঠিল। ওদিকে বাঁকার মুখখানাও হঠাৎ কাগজের মত শাদা হইয়া গেল। প্রবল আকুলতার সহিত সে জিজ্ঞাসা করিল,—কেনে, কেনে ফুলী, সাঙ্গা কর্‌বি নাই? নফরা ছাড়া কি আর মরদ্ নাই? তুর ডবল যাদের বয়েস, তারাও দ্যাখ্ সাঙ্গা করছে। আর এত কম বয়েস থেকে তুই কেনে একলা এক্‌লা থাকবি?"

"আমার সখ!"—ফুলী ঝঙ্কার দিয়া উত্তর করিল,—"নাই-বা থাকলো মরদ, মরদ না হলে কি আমার চলবেক্ নাই? খুব চলবেক্! তুদের জাত,—উ সবাই এক রকম! নফরাতে আর তুথে তফাৎ কি? আমি আর কারু পীরিতে ভুল্‌ছি নাই।"

বাঁকা জোরে একটা হাত তালি দিয়া বলিল,—মাইরি, কুন্ শালা মিছে কথা বল্‌ছে, আমি তুখে মাথায় করে রাখ্‌বো। হিঁদু কি জানে কুঁক্‌ড়োর মম্ম? শালা নফরার সাধ্যি কি তুর মম্ম বুঝে! তুখে দুঃখু দিয়েই ত শালা বটগাছ—সহসা ফুলী ধমক দিয়া উঠিল,—"যা, যা, খামকা লোককে গাল দিস না! নফরা ত তুর কিছু ক্ষেতি করতে আসে নাই যে, উয়োকে কথায় কথায় গাল দিছিস? ছাড়্, পথ ছাড়্, ঐ দেখ্, লোক আস্‌ছে।"

ব্যস্তসমস্তভাবে একেবারে ফুলীর হাত ধরিয়া ফেলিয়া বাঁকা বলিল,—মাইরি, মাইরি বলছি ফুলী,—

'ধ্যেৎ'! বাঁকাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই ফুলী তাহার হাতখানা সজোরে ছাড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল। পিছনদিকে আর একবার ফিরিয়াও চাহিল না। বাঁকা হতভম্বের মত হাঁ-করিয়া ফুলীর গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল। ফুলীর এক একটি পাদক্ষেপে তখন যেন তাহার বুকের এক একখানি পাঁজরা ভাঙিয়া যাইতেছে!

নফরার সুখের যেন আর অন্ত নাই!

লখীকে লইয়া দিনের পর দিন সে এখন কত রঙীন কল্পনার জালই না বুনিয়া চলিয়াছে! ফুলীকে যে সে কোনদিন বিবাহও করিয়াছিল,—ইহাও যেন আজকাল তাহার মনের কোণে জাগিয়া উঠিবার সুযোগ পায় না।

নফরা হাসিতে হাসিতে বলে,—"শুন্‌লি লখী, আর জম্মে তুই ঠিক আমারই বৌ ছিলি। তুখে না পেলে আজ আমি হয়ত মরেই যেতম।"

লখী নফরার গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টির মধ্য দিয়া নফরার প্রাণে খানিকটা যেন মদিরা ঢালিয়া দিয়াই উত্তর দেয়,—'ইস্, অত ভাল আর বাস্‌তে হয় না! মরদ মানুষ—'পেথম পেথম' অমন অনেক কথাই বলে। তা'পর মেয়েমানুষের যৈবন চলে গেলে আর ভাল ক'রে রা-ও কাড়ে

না! আমার এখন উঠ্‌তি বয়েস'—সে একবার নিজের যৌবন-তরঙ্গায়িত সুপুষ্ট তনু ও সমুন্নত বক্ষের দিকে চাহিল,—'তাই আমাকে এখন তুর খুবই ভাল লাগ্‌ছে। দু' একট' ছেলে-পিলে হ'য়ে বয়সে প'ড়ে গেলে—দেখ্‌ব তুর কত ভালবাসা থাকে!

নফরা লখীকে সজোরে বুকে চাপিয়া ধরে,—আদরের ধমক দিয়া বলে,—চুপ, ফের যদি অমন কথা বলবি—আমি বিষ খেয়ে মরবো। তুর বয়েস পড়েই যাক,—আর তুই বুড়ীই হ',—আমার লজরে চিরকাল এমনিই থাক্‌বি।

"সত্যি?"—চোখে-মুখে কেমন একটা মাধুরী ফুটাইয়া লখী প্রশ্ন করে।

"সত্যি নয় কি মিছে বলছি?"—নফরা আরও জোরে লখীকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুমায় চুমায় তাহার সারা মুখখানা লাল করিয়া দেয়। লখী আবেশে বিবশ হইয়া নফরার বুকে এলাইয়া পড়ে!

এমনি করিয়াই তাহাদের দিনগুলি এক মধুময় স্বপ্ন-মুহূর্ত্তের মতই কাটিয়া যায়।

ফুলীকেও নফরা একদিন এইরূপই ভালবাসিয়াছিল। আর সে ভালবাসার মূলে ছিল নৈতিকতা ও প্রেম। কিন্তু লখীর প্রতি তাহার ভালবাসার উৎপত্তি হইয়াছে কাম ও মোহ হইতে। কিন্তু লখী সে সব বোঝে না। সে নফরাকে আত্ম-দান করিয়াছে, এবং তাহার যাহা চাহিবার তাহা পাইয়াছে; নফরাও তাহাকে পাইয়া আত্মহারা,—বিভোর! স্থূলদৃষ্টিতে

লখী এইটুকু মাত্রই দেখিতে পায়,—এবং ইহাতেই সে পরিতৃপ্ত! নফরার ভালবাসার সম্বন্ধ তাহার রক্তমাংসের সহিত,—না তাহার প্রাণের সহিত,—তাহা ভাবিবার মত কোনরূপ দ্বন্দ্ব তাহার মনে কোনদিনই জাগিয়া উঠে না।

অবশ্য সেজন্য তাহাকে দোষ দিবারও কিছু নাই। শিক্ষিত ও অভিজাত বলিয়া যাহাদের পরিচয়, তাহাদের বাড়ীর মেয়েরাই যখন আকাঙ্ক্ষানুযায়ী অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি পাইলে এক দৈহিক ক্ষুধা মিটিলেই স্বামীর মনুষ্যোচিত এবং স্বামীর উচিত আর কোন গুণ আছে কিনা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা বিচার করিয়া দেখিরার প্রয়োজনও মনে করে না,—অথবা সেরূপ ক্ষেত্রে মানুষ-রূপী পশুরও পত্নীত্ব লাভ করিয়া সুখী হইতে পারে; তখন বাউরীঘরের মেয়ে লখী, যে তাহার দুরন্ত যৌবনে স্বামীর নিকট হইতে কামনানুরূপ কিছুই পায় নাই,—আজ নফরাকে সাঙ্গা করিয়া একজন বাউরী তরুণীর আকাঙ্ক্ষার অনুপাতে তাহার সাধ যদি মিটিয়া থাকে; তবে নফরার প্রেমের সম্বন্ধ তাহার রক্তমাংসের সহিত,—না তাহার প্রাণের সহিত, এবং নফরার হৃদয়ের মধ্যে যে নফরা রহিয়াছে, সে প্রকৃতই ভালবাসা পাইবার যোগ্য কিনা, এসব বিচার করিবার মত অনুভূতি যদি তাহার প্রাণে নাই জাগে; তবে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় কিরূপে এবং কোন্ যুক্তিতে?...

বাঁকার চোখে কিন্তু ঘুম নাই। ফুলী তাহাকে নিরাশ

করিয়া ফিরাইয়া দিলেও বাঁকা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ফুলীকে ভুলিতে পারিতেছে না। অনুক্ষণ শুধু তাহার এই একই চিন্তা হইয়াছে,—কেমন করিয়া সে ফুলীর হৃদয় জয় করিবে? কিরূপে ফুলীকে তাহার জীবন-পথের সাথী করিয়া লইবে?

ভাবিয়া ভাবিয়া সে অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু বিফল! তাহার চঞ্চল মস্তিষ্কে ফুলীকে লাভ করিবার কোনরূপ উপায়-বুদ্ধিই জাগিল না। এক একবার সে ভাবে—আচ্ছা, নফরার চেহারা কি আমার চেয়ে ভাল? না, সে আমার চেয়েও বেশী রোজগার করিতে পারে? নফরাকে পাইয়া ফুলী খুবই সুখী হইয়াছিল,—কিন্তু আমাকে সে সাঙ্গাই করিতে চায় না! কেন? আর যদিই নফরা আমার চেয়ে 'সরেস'ই হয়,—তাহাতেই বা ফুলীর কি যায় আসে? নফরার দিকে তাকাইয়া তাহার ত আর কিছু লাভ নাই? তবে—তবে কেন সে আমার কথায় রাজী হইতে চায় না?

সমস্যাটা বাঁকার কাছে জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিল। অবশেষে সে একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পুনরায় একদিন মহেশের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

মহেশ তাহাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল,—কিরে বাঁকা, কই—ই-দিকে আর যে এলি নাই? ফুলীকে সে কথা বলেছিলি নাকি?

মাত্র ঘাড় নাড়িয়া মহেশের কথার জবাব দিয়া বাঁকা মহেশের

পাশে বসিয়া পড়িল। মহেশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—কি বল্‌লেক ফুলী।

'না—হে,'—বাঁকা বিরস মুখে জবাব দিল,—'তুর বিটি রাজী হতে চায় না। বলে, আর আমি সাঙ্গা-টাঙ্গা করবো নাই। উ-নফরা, বাঁকা সবাই এক, আমি আর কারু কথায় ভুল্‌ছি নাই।

নিতান্ত অরসিকের মতই মহেশ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল! এ-হেন দুঃখের প্রসঙ্গে মহেশের অট্টহাস্যে বাঁকার পিত্ত পর্য্যন্ত জ্বলিয়া গেল। সে একটু বিরক্তভাবেই বলিল,—"ওই, অত হাস্‌ছিস্‌ কেনে হে? হাসির কি কথা আছে ইয়েতে?

পরম অভিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে মহেশ জবাব দিল,—"না, না, তুর এক কড়াও বুদ্ধি নাই বাঁকা! আমি ফুলীর বাপ, কিন্তুক তুর বুদ্ধির বহর দেখে আমার দুঃখু হছে। তুখে দু'টো হক্‌ কথা না বলেও থাক্‌তে লার্‌ছি। দেখেশুনে আমরা বুড়োই গেলম। বলি মেয়েমানুযের মন কি অত সহজে পাওয়া যায় রে বাঁকা! তার জন্যে পইলে পইলে কিছু খরচা কর্‌তে হয়।"

"কি রকম?"—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বাঁকা মহেশের মুখের দিকে তাকাইল।

মহেশ উত্তর দিল,—রকম আর কি? এগুতে পাঁচটা জিনিষ-পত্তর দিয়ে-থুয়ে উয়োর মন ফিরেতে হবেক ত? উয়োর মনটির ত আর সুখ নাই! পাঁচটা জিনিষ দিতে থুতে

উয়োর মন ফিরবেক, তখন উ দেখ্‌বি তুখে সাঙ্গা ক'র্‌তে রাজী হ'য়ে যাবেক। আমি বাপ হ'য়ে আর ই-সব কথা কত বল্‌বো, বল্? তবে কি-না, তুই উয়োকে সাঙ্গা কর্‌তে চাস্, আর উয়োর একটা হিল্লে ক'রে দিতে পার্‌লে আমারও গা খালাস হয়,—তাই তুখে দুটো শিক্ষে দিছি। ই-শুধু তুদের মিল ক'রে দিবার জন্যে; বুঝ্‌লি?

বাঁকা সবই বুঝিল; এবং মহেশের কথাগুলো তাহার মনেও ধরিল। সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর দিল,—তা' তুর শিক্ষে আমার মনে ধ'রেছে হে। আর কিছু বল্‌তে হবেক নাই। এগুতে যদি বুঝ্‌তম্—তাহলে কি আর এত ভেবে মর্‌তম? আচ্ছা, এখন উঠ্‌লম তবে, কাল বিকেলে আমি আবার আস্‌বো।

'হুঁ'—মহেশ উৎসাহভরেই জবাব দিল,—পাঁচবার যাওয়া-আসা কর্,—পাঁচটা জিনিষ-পত্তর দে,—দেখ্‌বি দু'চারদিন পরেই ফুলীর মন ফিরে যাবেক।

বাঁকা আর কোন কথা না বলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে রাস্তায় আসিয়া নামিল।

পরদিন,—বেলা প্রায় দশটার সময় দেখা গেল,—বাঁকা গিরীন ঘটকের বৈঠকখানার দরজায় নিতান্ত অপরাধীর মতই দাঁড়াইয়া আছে। সে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া দেখিয়াছে,—ফুলীর মন পাইতে হইলে,—সম্প্রতি যাহা যাহা দিতে হইবে,—

তাহার জন্য কম পক্ষে পাঁচটি টাকার দরকার। কিন্তু যাহারা দিন আনে, দিন খায়, তাহাদের হাতে এককালীন পাঁচ-দশ টাকা পুঁজি থাকা অসম্ভবই বটে। সেরূপ কোন দায়ে ঠেকিলে, তাহারা গ্রামের কোন কোন ভদ্রলোকের নিকট হইতে ধার-কর্জ্জ করিয়া কাজ চালাইয়া লয়। পরে কাজের মুজুরী হইতে সপ্তাহে কিছুকিছু করিয়া দিয়া সুদ-সমেত দেনা পরিশোধ করে। অবশ্য এই দেনা পরিশোধ করিতে দুইচার বছরও পার হইয়া যায়—এবং পাঁচ টাকা কর্জ্জ করিয়া তাহার সুদই গনিয়া যাইতে হয়,—পঞ্চাশ টাকা! কিন্তু তবুও দায়ে ঠেকিলে ভদ্রলোক-দের দ্বারে হাত না পাতিলে ডোম-বাউরীদের চলে না।

বাঁকাও গিরীন ঘটকের নিকট পাঁচটি টাকা কর্জ্জ করিতে আসিয়াছে। ঘটকেব নিকট সে তাহার আর্জ্জি পেশও করিয়াছে। কিন্তু ঘটক এখনও কোন উত্তর দেন নাই। গম্ভীরভাবে বিষয়টা চিন্তা করিতেছেন।

অনেকক্ষণ পরে ঘটকের মুখে কথা ফুটিল,—"হুঁ, দেখ বাঁকা,"—তিনি বেশ ভারিক্কী চালেই বলিলেন,—'পাঁচটা টাকা আমি তোকে কর্জ্জ দিতে পারি বটে,—কিন্তু সুদ দিতে হবে ফি-টাকায় মাসে চার আনা। আসল শোধ করতে তোর দেরী হয়, হবে; তবে সুদের পয়সা হপ্তায় হপ্তায় কিছু কিছু দিয়ে ফি-মাসেই মিটিয়ে দিতে হবে।...বুঝ্‌লি?'

বুঝিতে অবশ্য বাঁকার কিছুই বাকী ছিল না। কিন্তু সুদের পরিমাণ শুনিয়া সে আঁৎকাইয়া উঠিল! হাত দুইটা যোড়

করিয়া বলিল,—না, কত্তা, অত সুদ দিতে লার্‌বো। তাহলে না খেয়ে মরে যাব। আপুনি অল্প দয়া কর। আমি টাকায় দু-আনা ক'রে সুদ দিব।

ঘটক প্রথমটা তাহাতে রাজী হইলেন না। কিন্তু বাঁকা বিস্তর পীড়াপীড়ি করিতে তিনি বলিলেন,—আচ্ছা,—তুই হলি মিতন বাউরীর ছেলে,—মিতন এক সময় আমার কত কাজেরই না আসান ক'রেছে! তার খাতিরে তোকে দু' আনা সুদেই টাকা দিচ্ছি। কিন্তু তোদের পাড়ার আর কাউকে বলিস্‌নি যেন।"—বলিয়াই তিনি বৈঠকখানা হইতে উঠিয়া ঘরের মধ্যে গেলেন; এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া বাঁকার হাতে আল্‌গোছে টাকাগুলি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—নে, ভাল ক'রে গুণে বাজিয়ে নে। একেবারে সব নতুন কর্‌করে টাকা।"

টাকা কয়টি গনিয়াই বাঁকা একটু বিস্মিত হইয়াই ঘটকের মুখের দিকে চাহিল। "এজ্ঞে কত্তা",—ভয়ে ভয়ে কুণ্ঠিতভাবেই সে বলিল,—"পূরো পাঁচটাকা ত নাই? চার টাকা ছ' আনা আছে।"

"তাই ত থাক্‌বে রে বোকা!"—গিরীন ঘটক নির্ব্বিকার ভাবে বলিলেন,—'এই মাসের সুদ দশ আনা কেটেই রাখ্‌লাম। এতে আর আশ্চর্য্যি হচ্ছিস্‌ কেন? এইত নিয়ম! তোদের পাড়ার সকলকে জিজ্ঞেস্‌ করে দেখিস্‌।—যত টাকা কর্জ্জ নেবে,—তার প্রথম মাসের সুদ টাকা নেবার সময়ই সেই টাকার থেকেই বাদ পড়্‌বে।"

বাঁকা কিছুক্ষণের জন্য হাঁ-করিয়া ঘটকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। 'নিয়মটার' সম্বন্ধে হয়ত তাহার সেরূপ কোন জ্ঞান ছিল না। বিস্ময়ের ঘোর কতকটা কাটিলে সে বলিল,—"কিন্তুক, ই-মাসের আর ত মোটে তিন দিন আছে, কত্তা ?"

"হা-হা-হা, তুই আমায় হাসালি রে বাঁকা !"—খুব একচোট হাসিয়াই গিরীন ঘটক উত্তর দিলেন,—'বলি এ আবার কে না জানে যে, টাকা যে মাসে নেবে, সে মাসের য'দিনই বাকী থাক্,—সুদ পূরো মাসের দিতে হবে ? যা-যা বকাস্‌নে ; আমার অন্য কাজ আছে। 'মিতনের খাতিরে' তোকে টাকা ধার দিলুম, এই ঢের ! তার ওপর আবার বারসতের কথা ! যা, এখন। সুদের পয়সাটা ঠিক্ ঠিক্ পৌঁছে দিয়ে যাস্ কিন্তু। নইলে বুঝ্‌ছিস ত '?—বলিয়াই তিনি চোখমুখের একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করিলেন ; কিন্তু কথাটা আর প্রকাশ করিয়া বলিলেন না।

তা' না বলুন,—বাঁকা সবই বুঝিয়া লইল। যেহেতু গ্রামের জমিদারী ঘটকদের ; এবং গিরীন ঘটকের তাহাতে কিঞ্চিৎ মানে আধ পয়সা অংশ ছিল। বাঁকা কিছু গোল বাধাইলে—তিনি যে তাঁহার রাজ-শক্তি প্রয়োগ করিয়া বাঁকার কুঁড়েখানি পর্য্যন্ত ধূলিসাৎ করিয়া ছাড়িবেন ; ইহাতে আর বেশী করিয়া বুঝাইবার কি আছে ? যাই হোক, বাঁকা আর কিছু না বলিয়া পাঁচটাকা কর্জ্জ করিয়া চার টাকা ছয় আনা লইয়াই ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল...।
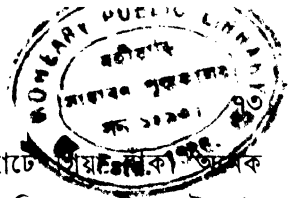
সেইদিনই বিকালে ইছাপুরের হাটে গিয়া বাঁকা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এবং বহু দেখিয়া শুনিয়া—ফুলীকে উপহার দিবার জন্য কয়েকটি জিনিষ কিনিয়া ফেলিল। তাহাতে তাহার চার টাকা ছয় আনার প্রায় সবই নিঃশেষ হইয়া গেল। সে কিনিল, একখানা দশহাত লাল চওড়া পাড় শাড়ী,—একখানি লাল টুক্‌টুকে তিনহাত গামছা,—একখানা জাপানী আয়না, একটা গালার চিরুণী,—একখানা সাবান, একশিশি গন্ধ তেল, চার গাছা গিল্টি-করা পিতলের চুড়ি। তাহার উপর সস্তা দামের একটা মুখে-মাখা স্নো। সর্ব্বশেষে তহবিল গনিয়া সে একখানা নীল-রঙে-ছোপান সেমিজও কিনিয়া ফেলিল। জিনিষগুলি সযত্নে গামছার মধ্যে বাঁধিয়া বাঁকা মহানন্দেই হাট হইতে ফিরিল।

এতগুলি উপহার-দ্রব্য পাইয়া ফুলীর মন যে এবার নিশ্চয়ই তাহার দিকে ফিরিবে,—ইহাতে বাঁকার আর অনুমাত্রও সন্দেহ রহিল না। পথ চলিতে চলিতে সে নানা রঙীন কল্পনায় বিভোর হইয়া উঠিল! কল্পনার চক্ষে সে যেন দেখিল, ফুলী তাহার পাশে বসিয়া হাসিয়া হাসিয়া প্রেমের কথা কহিতেছে। ফুলী তাহার ঘরের গৃহিণী হইয়া চারিদিকে আনন্দে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে,—ফুলীকে সঙ্গে লইয়া সে আনন্দে মাদল বাজাইয়া গান গাহিতেছে!...সুখের কল্পনাতেই বোধহয় সুখ বেশী। তাই ঐ কল্পনাগুলির মধ্যে বাঁকা পরম সুখেরই আস্বাদ পাইতে লাগিল।

পথেই একটা গ্রামের ধারে পচুই মদের দোকান। বাঁকার

পকেটে তখনও দুই-তিন আনা পয়সা ছিল। মদের দোকান দেখিয়াই সে যেন উল্লসিত হইয়াই সেখানে ঢুকিয়া পড়িল।

দোকানের প্রাঙ্গনে একপাশে বসিয়া একটা লোক ঝাল্‌বড়া, পেঁয়াজবড়া,—বেগুনী, ফুলুরী, ছোলাভাজা, মুড়ি, লঙ্কা ইত্যাদি মদের চাট্‌ বিক্রয় করিতেছিল। বাঁকা দুই পয়সার পেঁয়াজবড়া কিনিয়া একটা বড় রকমের পাকা লঙ্কা চাহিয়া লইয়া দোকানে ঢুকিল। তাহার পর ছয় পয়সার মদ কিনিয়া চাট্‌ দিয়া তাহা নিঃশেষে পান করিয়া আবার রাস্তায় নামিল।

এবার তাহার মন আরও রঙীন হইয়া উঠিয়াছে! সময়ে সময়ে তাহার মনে হইতে লাগিল,—ফুলী যেন তাহার পাশে পাশেই চলিতেছে। মনের আনন্দে সে গান ধরিল,—

তুর পীরিতে মন মজেছে সইলো
মন মজেছে সই!
ও-সজনী, পাইনে আমি
রসের যে তুর থই লো
রসের যে তুর থই!!

মদের নেশা তখন খুবই চাপিয়া গিয়াছে। গান গাহিতে গাহিতে বাঁকা রাস্তার মাঝেই নাচিতে আরম্ভ করিয়া দিল। নির্জ্জন পথ,—বাঁকার নৃত্য-গীতের রস উপভোগ করিবার লোক জুটিল না। আর জুটিলেও—হয়ত সে বাঁকার সেই অবস্থা দেখিয়া তাহাকে পাগল বলিয়াই ধারণা করিত।

সন্ধ্যার একটু আগেই বাঁকা সমস্ত জিনিষগুলি লইয়া একেবারে মহেশের কাছে গিয়াই উপস্থিত হইল। ফুলী তখন ঘরে ছিল না। পাড়ার কাহারও ঘরে বেড়াইতে গিয়াছিল।

গামছা খুলিয়া বাঁকা সমস্ত জিনিষই একে একে মহেশকে দেখাইল। মদের নেশায় মহেশও তখন একটু বেচাল হইয়াছিল! জিনিষগুলি দেখিয়া সে আনন্দ প্রকাশ করিয়াই বলিল,—বাঃ, তুর দিল্ আছে বাঁকা। তা' তুই পারবি ফুলীর মন লিতে। হুঁ, ঠিক, এই ত চাই ; নইলে মেয়েমানুষের মন কি পাওয়া যায় অমনি! তুদের বয়েসে ঐ ফুলীর মায়ের মন পেতে আমাকে এমন কত 'দব্যিই' না দিতে হয়েছে! কিন্তুক, মাগী বাঁচ্লো কই? তা'পর ফুলীর সৎমাকেও আবার যখন সাঙ্গা করি,— তখনও কি কম হেঙ্গামারে বাঁকা! সাঙ্গার আগে উয়োকে এমন কত জিনিষই না দিয়েছি, তবে ত উয়োর মন পেয়েছিলম।"

ভাবিনী ঘরের ভিতর হইতে সবই দেখিতেছিল,—সবই শুনিতেছিল। হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—'আ—মর্, বুড়ো মুন্সের রঙ্ দেখ! লাজ-সরমের মাথা খেয়ে যা মুখে আসছে, তাই বলে যেছে! আজ ক'ভাঁড় মদ খেয়েছিস?'

মহেশ প্রথমটা একটু অপ্রতিভ হইয়াই উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই বেশ সপ্রতিভভাবেই উত্তর দিল,—'তা ই-আর খারাপ কি বল্লম? দুনিয়ার সারাই চিরকাল এই চল্‌ছে। তুর আমার বেলায়ও যা'—ইয়েদের বেলায়ও তা!—হাত আড়াল দিয়ে বাপ-খুড়ার কাছে তামুক খাওয়া,—আর ই-সব

ব্যাপারে লাজ-সরম রেখে কথা কওয়া—দুইই এক। তা শুনেছিস্ ত,—বাঁকা আমাদের ফুলীকে সাঙ্গা কর্‌তে চায়। ফুলীর জন্যে আজ উ ইছেপুরের হাটে এই সব কিনে এনেছে। দেখ্ দেখি, কেমন হবেক।

ভাবিনী এতক্ষণে যেন নিজের একটু মূল্য বোধ করিল। বাহিরে আসিয়া জিনিষগুলি একে একে দেখিয়া সে বলিল,—'তা' বাঁকার পছন্দ আছে। নফরাও ফুলীকে বোধহয় একসাথে কখনও এত সব 'দব্যি' 'কিনে দেয় নাই। বাঁকার সাথে সাঙ্গা হ'লে ফুলীর সুখের ঘরকন্না হবেক। এখন ফুলীর মন বাঁকার দিকে ফির্‌লেই হয়।

বাঁকার বুকটা হঠাৎ ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল!—অ্যাঁ, ফুলীর মন কি এত করিয়াও ফিরিবে না?

মহেশ জোর গলায় বলিল,—খুব ফির্‌বেক্, কেনে—নফরা উয়োকে এত কি সুখে রেখেছিল যে—বাঁকার দিকে উয়োর মন ফির্‌বেক নাই। বাঁকা যে রকম উয়োকে ভালবাসে,—আর যে রকম দিতে থুতে আরম্ভ করেছে,—তাথে দেখে লিস্, ফুলীর মন বাঁকার দিকে ফির্‌লো বলে!

বাঁকার কম্পিত বুক মহেশের কথায় আবার শান্ত হইল,—ঠিকই ত, ফুলী বাউরী-ঘরের মেয়ে, না—আর কিছু! স্বামী যাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে,—বাউরী-ঘরে জন্মিয়া সে আবার কোথায় সাঙ্গা করে নাই? ফুলী কি একটা নূতন কিছু করিবে?

মহেশ পুনরায় বলিল,—তা' বস্ তুই বাঁকা। তখন কে তামুক খা। ফুলী আসুক; ই-সব জিনিষ উয়োকে তুই নিজের হাতেই দিয়ে যাবি।

বাঁকার কিন্তু তাহাতে সংকোচ, এমন কি একটু ভয়ও হইল। সেদিন ময়রা-দীঘির পাড়ে সে ফুলীর যে মূর্ত্তি দেখিয়া আসিয়াছে,—তাহাতে সাঙ্গার প্রস্তাব লইয়া আবার এত শীঘ্র তাহার সম্মুখীন হইতে বাঁকার সেরূপ সাহস হইতেছিল না। তাহার মতলব জিনিষগুলি সে রাখিয়া চলিয়া যাইবে,—মহেশ বা ভাবিনী তাহার নাম করিয়া সেগুলি ফুলীকে দিবে। তারপর উপহার লাভ করিয়া ফুলীর মন যখন একটু নরম হইবে—তখন সে ফুলীর সহিত পুনরায় দেখা করিবে। অতঃপর সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সে বলিল,—'আমি লিজে আর নাই বা দিলম হে? তুরাই দিয়ে দিবি আমার নাম করে উয়োকে। তা'পর আমি একদিন উয়োর সাথে দেখা ক'র্‌বো।"

মহেশ তাহাতে আপত্তি করিবার কোনরূপ কারণ দেখিল না। সে উত্তর দিল,—আচ্ছা, তাই হবেক। আসুক ফুলী।

বাঁকা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। মহেশ জিজ্ঞাসা করিল,—তামুক খাবি নাই?

"না, হে, এখন আর তামুক খাব নাই। ব'স্, চল্‌লম।"—আর মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া বাঁকা মহেশের গৃহ ত্যাগ করিল।

কিন্তু বিপদ হইল ফুলীকে লইয়াই। মহেশের উপদেশ-মত ভাবিনী যখন ফুলীকে বাঁকার দেওয়া উপহারগুলি দেখাইল,—এবং বাঁকাকে সাঙ্গা করা যে ফুলীর পক্ষে মঙ্গলেরই হইবে,—এইরূপ মতও প্রকাশ করিল, তখন ফুলী যেন একে-বারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল! চোখ মুখ ঘুরাইয়া বিকৃত কণ্ঠেই সে বলিল,—কেনে, তুরা ই-সব জিনিস্ রাখ্‌লি? আমি সাঙ্গা না করি ত তুদের বাবার কি? তাথে কি তুদের কিছু ফাট্‌ছে? আমি কর্‌বো নাই সাঙ্গা। তুরা উ-সব জিনিষ এখনই বাঁকাকে ফেরৎ দিয়ে আয়।

দেখিয়া শুনিয়া মহেশ ও ভাবিনী দুই জনেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল! এতগুলো জিনিষের উপর যে ফুলীর একটুও লোভ হইবে না,—ইহা মহেশ বা ভাবিনী ধারণা করিতেও পারে নাই। মহেশ একটু থতমত খাইয়াই বলিল,—তা, তুর এত রাগারাগি ক'রবার কি আছে ইয়েতে? কেউ ত তুর কিছু খারাপ ক'র্‌তে যায় নাই? আর বাঁকা কিছু মন্দ ছোক্‌রাও লয়, যে, উয়োকে সাঙ্গা কর্‌তে দোষ আছে! খামকা এত মেজাজ করছিস্ কেনে?

"বেশ কর্‌ছি।"—ফুলী তেমনি রুক্ষতার সহিতই জবাব দিল,—"বাঁকা, রামা, যেদো, নফরা আর কাহুকে আমি চাই না—চাই না। মাঝ্ থেকে তুরাই যত সব কাণ্ড কর্‌ছিস্!"

"কর্‌ছি কি আর সাধে?"—নাক সিট্‌কাইয়া ভাবিনী বলিয়া উঠিল,—'এই বয়েসে অনেক দেখ্‌লম লো, অনেক

দেখ্‌লম ! শেষকালে ইয়েকে উয়োকে নিয়ে ঢলাঢলি ক'র্‌াব.—তার চেয়ে ভালয় ভালয় এই সময় সাঙ্গা হয়ে গেলে আমরাও নিশ্চিন্তি,—আর একজনাকে নিয়ে ঘরকন্না পেতে তুরও মন থির থাক্‌বেক্‌। নইলে—

সহসা বাধা দিয়া ফুলী গর্জ্জিয়া উঠিল,—নইলে আমার কচু ? কেনে ? মরদ মানুষ না হলে কি মেয়েমানুষের চলে না ? ইয়েকে উয়োকে নিয়ে ঢলাঢলি কোন্‌ দুঃখে করতে যাব লো ? মা-বাপ হ'য়ে তুরা যা তা বলিস না বলছি। ফুলী বুঝি তারই মেয়ে মনে করিস্‌।' শেষের দিকে সে প্রায় কাঁদিয়াই ফেলিল !

গরমের কাজ নয় বুঝিয়া মহেশ এইবার কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নরম করিয়া বলিল,—কিন্তুক সোয়ামী যখন তুর তুখে ছেড়ে আর একজনকে নিয়ে ঘরকন্না করছে,—তখন তুরই বা বাঁকাকে সাঙ্গা করে ঘরকন্না পাত্‌তে দোষ কি বল্‌ত ? ইয়েতে কেউ ত তুখে খারাপ বলবেক নাই। বরং সবাই বলবেক,—হুঁ, ঠিকই করেছে !

ফুলী ঝাঁজিয়া উঠিল,—মুয়ে আগুন দিই বাঁকার ! বাঁকা বুঝি তুদের ঘুষ দিয়েছে,—তাই কেবল বাঁকা বাঁকা করছিস !

কথাটা ভাবিনীর বুকে বাজিল। আহত কণ্ঠে সে জবাব দিল,—আমাদিকে ঘুষ কেনে দিবেক লো ছুঁড়ী,—ঐ গ্যাখ্‌, তুখেই ঘুষ দিয়ে গেইছে। খবরদার, মুখে যা আসবেক, তাই বলিস না বলে দিছি।

কথায় কথায় পাছে একটা ঝগড়াই বাধিয়া যায়, এই ভয়ে

মহেশ শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল,—থাক, থাক, আর চেঁচামেচি করতে হবেক নাই। তা বাঁকাকে যদি তুর সাঙ্গা করতে ইচ্ছে না হয়,—না করবি। কিন্তুক, আরও ত লোক আছে। মোট কথা সাঙ্গা করাই তুর ভাল। আমি তুর বুড়া বাপ, তুর চাইতে অনেক বেশী বুঝি।

“বুঝিস ত বুঝিস্।”—ফুলী বিরক্ত হইয়াই উত্তর দিল,—কিন্তু আমি কিছুতেই সাঙ্গা করব নাই। থাম, আমি এখনি বাঁকার সব জিনিষ উয়োদের ঘরে যেয়ে ফেরৎ দিয়ে আসছি। উ কেনে, খামকা খামকা ই সব জিনিষ আমার নাম করে দিয়ে যাবেক ?”—বলিয়া সে সত্যসত্যই বাঁকার দেওয়া জিনিষগুলা গামছায় বাঁধিয়া তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্রপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মহেশ পশ্চাৎ হইতে ডাকিল,—এই ফুলী, রেতের বেলায় আর কেলেঙ্কারী করতে হবেক নাই। ফিরে আয়।

ফুলী পিছন ফিরিয়া চাহিলও না। ভাবিনী বিদ্রূপের সুরে বলিল,—বাবা লো, ! কত সতী থাকতে পারিস,—তা ইয়ের পর দেখ্‌বো !...

অগ্রহায়ণ-পৌষ মাস।

মাঠে মাঠে ধান পাকিয়া উঠিয়াছে! অবারিত প্রশস্ত মাঠের বুকে লুটাইয়া পড়া সবুজ-সোনালী ধানের স্বর্ণশীর্ষে কমলার স্নেহ-পীযূষ যেন উছলিয়া পড়িতেছে! মাঠের লক্ষ্মী ঘরে আসার আনন্দে এই দুই মাস পাড়াগাঁয়ে কি বড়—কি

ছোট, কি ভদ্র, কি ইতর প্রত্যেকেরই বাড়ীতে নানারূপ পূজা-পার্ব্বণ ও আমোদ-প্রমোদ চলিয়া থাকে। নবান্ন এবং পিষ্টক-পার্ব্বণের ধূমই হয় এ সময় সবচেয়ে বেশী।

জন-মজুর খাটিয়া যাহারা দুঃখে কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এ সময়টা তাহাদেরও চলে কিছু ভালই। তাহাদিগকে একদিনও বসিয়া খাইতে হয় না। কাজেই অন্য সব সময় হইতে এই সময়টা তাহারা কিছু বেশীই রোজগার করিয়া থাকে। কিন্তু করিলে কি হইবে? তাহারা কোনদিনই সঞ্চয় করিতে শিখে নাই। রোজ আনা, এবং রোজ খরচ করিয়া ফেলা অভ্যাসটা যেন তাহাদের মজ্জাগত হইয়াই গেছে। যখন কিছু বেশী রোজগার করে,—তখন বেশীবেশী মদ খাইয়া এবং দেদার আমোদ-প্রমোদ করিয়া তাহা উড়াইয়াও দেয়। কিন্তু ইহাদের একটা বিশেষ গুণ আছে। যখন পায়, তখন যেমন আনন্দে আমোদ-প্রমোদ করিয়া দিন কাটাইয়া দেয়; যখন পায় না, তখনও আবার তেমনি নির্ব্বিকারভাবেই দুঃখের জ্বালা সহ্য করিয়া যায়।

নফরা বরাবরই পরিশ্রমী। পরিশ্রম করিতে পারে বলিয়াই প্রায় কোন সময়ই তাহাকে বসিয়া থাকিতে হয় না। আর এ সময়ের ত কথাই নাই। এখন সে প্রত্যেক দিনই তাহার দৈনন্দিন সংসার খরচের কিছু বেশিই উপার্জ্জন করিয়া চলিয়াছে। তবে খরচের দিক দিয়াও সে হাত এমন দরাজ করিয়া দিয়াছে যে, একটি পয়সাও জমিয়া উঠিবার সুযোগ পায় না।

কিন্তু লখী চালাক মেয়ে। নফরার অজ্ঞাতসারেই সে দুই-চারি আনা সঞ্চয় করে। অবশ্য এই সঞ্চয়-প্রবৃত্তিটা অসময়ের কথা স্মরণ করিয়া তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে নাই; জাগিয়াছে পৌষ-সংক্রান্তির পরবের দিকে চাহিয়াই।

পৌষ-সংক্রান্তি,—পাড়াগাঁয়ে সে এক মহা আনন্দের দিন! লক্ষ্মীপূজা এবং পায়স-পিষ্টকের উৎসবে পল্লীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যেন সেদিন আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠে! ঘরে ঘরে তিলের নাড়ু, চাঁছির (ক্ষীরের) সন্দেশ, নারকেলের মেঠাই প্রভৃতি কত মিষ্টান্নই না উক্ত পরবের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হয়!

নফরাদের গ্রামের দক্ষিণে অদূরেই দামোদর নদ প্রবাহিত। মকর স্নান বা পৌষ-সংক্রান্তির দিন, ইতর, ভদ্র, অনেকেই ভাল ভাল জামা-কাপড় পরিয়া দামোদরে মকর-স্নান করিতে যায়।...নদীতীরে সে এক বিরাট আনন্দের মেলা! চারিপাশের গ্রামসমূহ হইতে দলে দলে পুরুষ-নারী, ছেলে-মেয়ে নদীর তীরে সমাগত হইয়া বিচিত্র কলরবে নদীর দুই কূল মাতাইয়া তোলে,—অসংখ্য স্নানার্থীর অঙ্গস্পর্শে দামোদরের জল ছল্-ছল্ কল্-কল্ করিয়া উঠে!...

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই নফরা কাজ হইতে ঘরে ফিরিয়াছে। চালার একটা খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া বসিয়া সে আরামে তামাক টানিতেছিল। লখী তাহার নিকট আসিয়া হাসিতে হাসিতে

বলিল,—"পউষ-পরব ত এসে পড়্লো রে নফরা! মকর-চান কর্‌তে যাবি ত ?"

যেন একটা খুবই প্রয়োজনীয় বিষয় লখী মনে করিয়া দিয়াছে,—এইরূপ উৎসাহের সহিতই নফরা উত্তর দিল,—"ঐ বলিস কি ? তা আবার যাব নাই ? আমার ত মনেই ছিল নাই পরবের কথা! পরবকে আর কদ্দিন আছে বল দেখি ?"

"আবার দিন কুথারে ?"—লখী চোখ নাচাইয়া বলিল,— "মাস্তর আর চারটি দিন আছে। তা পরব করতে যাব কি প'রেরে। লতুন কাপড় চাই না ?

নফরা একটু ভাবনায় পড়িয়া গেল। বলা বাহুল্য, পয়সা তাহার হাতে জমা ছিল না। নূতন কাপড়-চোপড় কিনিতে যে পরিমাণ অর্থের দরকার,—দুই তিন দিনের মধ্যে তাহা সংগ্রহ করাও সহজ নহে। সুতরাং কিছুক্ষণ চিন্তা করিবার পর সে ধীরে ধীরে বলিল,—'তাইত রে লখী, আর দিন কতক আগে ব'ল্‌তিস ত খুব ভাল হতো। মাঝে আর দুদিন খাটালী হবেক। ইয়ের মধ্যে অত পয়সা কুথা যে পাই—।'

সে আবার চিন্তা করিতে লাগিল।

লখী মৃদু হাসিয়া বিদ্রূপের সুরে বলিল,—'লে, তুখে আর ভাব্‌তে হবেক নাই। তুই কত মরদ, তা আমার জানা আছে! আমি পয়সা দিব,—তুই হাট থেকে খুব চওড়া পাড় দেখে একখানা শাড়ী কিনে আনিস।

নফরার মুখে হাসি ফুটিল।—"তুই কুথা পয়সা পেলি রে ?"

একটু রহস্য করিবার অভিপ্রায়েই সে বলিল,—'চুপি-চুপি কারু সাথে পীরিত কর্‌ছিস নাই ত আবার? দেখিস! তাহালে—'

তীব্র কটাক্ষে নফরাকে শাসাইয়া—লখী মুখ-ঝাম্‌টা দিয়া বলিল,—যা, যা, আর ইয়ে করতে হবেক নাই? পরবের সময় মাগকে কি দিতে হবেক, তার হুঁস নাই,—আবার যা তা বলে মস্‌করা ক'র্‌তে আস্‌ছে! আমি কি তুর মতন মুণ্ডুরে মনে করিস? ঘর-খরচের পয়সার থেকেই পরবের জন্যে দুচার পয়সা করে জমা করে রেখেছি, বুঝ্‌লি?

নফরা এবার একটু অপ্রতিভ হইয়াই বলিল,—না-রে-না, রাগ্ করিস্ না। রঙ্-তামাসা ক'রে বল্‌লম। তা' তুর হাতে এখন যা' আছে দিস্, কাপড় কিনে আনবো। তা'পর তুর পয়সা আমি তুখে ফেরৎ দিব।

'আচ্ছা, আচ্ছা, তাই দিস্।' চোখ-ভরা কৌতুক লইয়া পরিহাস-তরল কণ্ঠে লখী উত্তর দিল,—'কিন্তুক দেখিস্, কাপড় যেন দশহাতী আনিস্ না। আজকাল ইগার হাতী শাড়ী দেদার পাওয়া যায়। সেই একখানা আন্‌বি। বুঝ্‌লি?

নফরা একটু বিস্মিতভাবেই প্রশ্ন করিল,—ইগার হাত শাড়ী নিয়ে কি হবেক রে?

লখী বলিল,—আজকাল শহরে-বাজারে বেবাক্ ভদ্দর লোকের মেয়েরা ইগারহাত শাড়ীই হেথা-সেথা যাবার সময় পরে। ঐ বামুন-পাড়ার শরণ টাঠুয্যের বিটি উয়োর সোয়ামীর

কাছে ক'ল্‌কেতায় থাকে। পরশু বাপের ঘর এসেছে। দেখলম্—ইগার হাত শাড়ীর এক রকম সবট'ই কমরেই ফ্যাচাং দিয়ে পরেছে। বুকে মাত্তর স্থাড় হাত কি দু'হাত তুলে রেখেছে। তাথে পিঠের বেবাক্ খালি আছে! তবে হঁ, গায়ে একট' লাল রঙের জামা আছে; তার নাম নাকি বেলাউস্! তারও আবার গলার কাছ থেকে বুকের কাছ্-তক্ খুলা;—কিন্তুক্ বাইজীদের মতন তা'থে উয়োকে দেখ্‌তে লাগ্‌ছে বেশ! আমার জন্যে ঐ রকম-একখানা জামাও কিনে আন্‌বি, বুঝ্‌লি? আমি ঐ রকম সেজেগুজে মকর চান কর্‌তে যাব। সেই উ-বছর বদ্ধমান থেকে বাইজীরা বামুন-পাড়ার বিয়েতে লাচ্‌তে এসেছিল,—দেখেছিলি?—অবিকল ঐ রকম লাগ্‌বেক!

নফরা চোখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল,—তা তুইও লাচ্‌বি না-কি? ঘুঙুর কিনে আন্‌বো?

"আচ্ছা অচ্ছা, তাই হবেক, তুই যদি মাদল বাজাস্—আমি একশবার লাচ্‌তে পারি।"

"পরবের দিন ত তুখে লাচ্‌তেই হবেক রে, নইলে ছাড়্‌বেক্ কে? আর আমি এমনই ক'রে তুর গলা ধরে—" বলিয়া নফরা দুই হাত বাড়াইয়া লখীর গলা ধরিতে গেল।

লখী একটু সরিয়া গিয়া বলিল,—থাম্, থাম্, উনোনে ভাত চাপান আছে; পুড়ে যাবেক। আগে ভাত নামাই।"

* * * *

বাঁকার মর্ম্মে কিন্তু ভারী আঘাত লাগিয়াছে। প্রেমের উপহার-স্বরূপ সে ফুলীকে যে জিনিষগুলি দিয়া আসিল,— ফুলী সেইগুলি কিনা অবহেলেই ফিরাইয়া দিয়া তাহাকে অপমান করিল! তাহাকে সে সাঙ্গা করুক বা না করুক, অন্ততঃ উপহৃত দ্রব্যগুলি গ্রহণ করিয়া তাহার ভালবাসার মর্য্যাদা রক্ষা করিতেও ত পারিত! কিন্তু—

ফুলীর দেওয়া আঘাতে বাঁকার মন যেন হাহাকার করিয়া উঠিতে লাগিল! কাজে-কর্ম্মে সে একেবারেই মন বসাইতে পারিল না।

উত্তেজনার বশে ফুলী জিনিষগুলি বাঁকাদের বাড়ীর সকলের সম্মুখেই ফেলিয়া দিয়া গিয়াছিল; সুতরাং বাঁকার পিতা মিতনেরও আর কিছুই অবিদিত ছিল না। পুত্রের মনের গতি বুঝিয়া সে একদিন বলিল,—তা' অত মনমরা হয়ে বেড়াবার তুর কি দরকার বল ত? নাই-বা কর্‌লেক ফুলী তুখে সাঙ্গা; হ্যাশে আর কি মেয়ে নাই? ওই ত ভজুরবাঁদের রামু আমাকে উ'দিন মদ-শালে বল্‌ছিল,—উয়োর ভাইঝির সোয়ামী ম'রে গেইছে। মেয়েট'র সাঙ্গা দিতে হবেক। বয়েস এই সতের কি আঠার। ছেলেপুলেও কিছু হয় নাই। আর দেখ্‌তেও নাকি খুব ভাল। রামুর মতলব তুর সাথেই উয়োর ভাইঝির সাঙ্গা দিবেক। তবে তুর মতলব না বুঝে আমি উয়োকে এখনও কিছু বলি নাই। রাজী আছিস্‌ ত বল,— আমি পাঁচ দিনের মধ্যেই সব ঠিকঠাক্ করে ফেলাব।

বাঁকার মন কিন্তু তাহাতে সায় দিল না। কেন না, ফুলীকে সে প্রকৃতই ভালবাসে। এতদিন ফুলী স্বামী লইয়া ঘর করিতেছিল। সুতরাং বাঁকার তাহাকে পাইবার আশা করা সঙ্গত ছিল না; সেটা নেহাতই পরকীয়া চর্চ্চা হইয়া দাঁড়াইত! কিন্তু আজ স্বামী-পরিত্যক্তা ফুলীকে বাঁকা যদি তাহার মর্ম্মনিহিত ভালবাসার মধ্য দিয়া এবং তাহাদের সমাজের রীতি-নীতির গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াই পাইতে চায়,—তবে তাহাকে দোষ দিবার কিছু থাকে না। পক্ষান্তরে ফুলীও যদি নফরার শত অত্যাচার-সত্ত্বেও তাহাকে ভুলিতে না পারিয়া বাঁকাকে সাঙ্গা করিতে অস্বীকার করে,—তবে তাহারও বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই। সুতরাং সমস্যা যেমন সরল, আবার তেমনি জটিল!

বাঁকার নিকট কোন উত্তর না পাইয়া মিতন ভাবিল,—হয়ত রামুর ভাইঝিকে সাঙ্গা করিবার কথাটা বাঁকা ভাবিয়া দেখিতেছে।..সুতরাং নিজের ধারণার বশেই সে পুনরায় বলিল, আচ্ছা, তুই ভেবে-চিন্তে দেখ্‌। মতলব ঠিক ক'রে আমাকে বল্‌বি। আমি ঝাঁ ক'রে একদিন ভজুরবাঁদ যেয়ে রামুর সাথে সাক্ষেৎ করে সাঙ্গার দিন ঠিক ক'রে আস্‌বো। বুঝ্‌লি?

বাঁকা যাহা বুঝিতেছিল,—তাহা আর মিতনের নিকট প্রকাশ করিবার নহে। কিন্তু তবুও সে একেবারে চুপ করিয়া থাকাটা উচিত বুঝিল না। পিতা যে প্রসঙ্গ তুলিয়াছে, তাহা উপস্থিত চাপা দিবার অভিপ্রায়েই সে বলিল,—আমি সে কথা বুঝে ব'ল্‌বো হে ইয়ের পর। তা'পর তুই ভজুরবাঁদ যাবি।

"হুঁ-হুঁ, তা বৈ-কি !"—ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে মিতন উত্তর দিল। বাঁকা আর কিছু না বলিয়া কি যেন ভাবিতে ভাবিতেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মকরস্নানের দিন লখীর সাজসজ্জার বহর দেখিয়া বাউরী-পাড়ার মেয়েরা—বিশেষ তাহার সমবয়স্কার দল চমকিতভাবেই বার-বার তাহার দিকে চাহিতে লাগিল। যেন তাহারা নূতন কিছু দেখিতেছে; যাহার মধ্যে একটা কেমন মাদকতাও আছে,—আর যাহা অপরের মনে রঙ্ ধরাইয়াও দিতে পারে !

দেবীর সাজ এবং নটীর সাজ,—এই দুই সজ্জাতেই নারীকে সুন্দর দেখায়। কিন্তু এই দুই প্রকার সৌন্দর্য্য-বিকাশের মধ্যে প্রভেদ রহিয়াছে অনেক। প্রথমোক্তটি নারীর প্রতি একটা শ্রদ্ধার, একটা সম্ভ্রমের ভাব জাগাইয়া দেয়,—আর শেষোক্তটি যেন নারীর অন্তর্নিহিত যৌন-কামনাটিকে প্রকটিত করিয়া তাহার প্রতি একটা লালসার ভাবই উদ্রিক্ত হইবার পক্ষে সাহায্য করে। বর্ত্তমান যুগের আবহাওয়ায় নারী—শতকরা পঁচানব্বই জনেরও বেশী—সাজসজ্জা প্রভৃতির মধ্য দিয়া যেন এই শেষোক্ত ভাবটিকেই প্রকটিত করিয়া পথ চলিয়াছে। এ ক্ষেত্রে কেহ যদি তাহার প্রতি আবিল দৃষ্টিতে চাহিয়াই ফেলে, অথচ নারী যদি মনে করে যে, তাহার দিকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে না চাহিয়া,—এমন কি চাহিয়াই পথিক অপরাধ করিয়াছে; তাহা হইলে ইহা বলা আদৌ অন্যায় নয় যে, তাহার সেই অপরাধ

নারীর সাজসজ্জা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। অবশ্য এরূপ ব্যক্তিরও অভাব নাই, যাঁহারা পথ-চলা এই 'সু'-সজ্জিতাদের প্রতি ঘৃণার দৃষ্টিতে চাহিতেও ঘৃণা বোধ না করেন! নিজের প্রতি অপরের মনে শ্রদ্ধার ভাব জাগাইয়া তুলিতে হইলে,—সাজসজ্জার মধ্যেও যে একটা পবিত্র সম্ভ্রম ও সংযমের ভাব থাকা প্রয়োজন,—একথা কে অস্বীকার করিবে? একই অভিনেতা যখন ভিন্ন-ভিন্ন সাজে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়,—তখন তাহার প্রতি ভিন্ন-ভিন্ন ভাবের উদয় হয় কেন?

সহুরে মেয়েদের অনুকরণ করিয়া লখী এগার হাত কাপড়খানা কোমরে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ঘাঙ্‌রার মত করিয়া পরিয়াছে। গায়ে একটা বুক-খোলা ব্লাউস পরিয়াছে। সে পাতা কাটিয়া কপাল ও কানের কাছ পর্য্যন্ত নামাইয়া চুল বাঁধিয়াছে। চুলে গন্ধ তেল মাখিয়াছে। কপালে একটি সোনা-পোকার টিপ পরিয়াছে,—জরদা দিয়া পান খাইয়া ঠোঁট রাঙা করিয়াছে। হাতের চেটোয় এবং আঙুলে মেহেদী পাতার রঙ্‌ দিয়াছে এবং পায়ে লাল টক্‌টকে আলতা পরিয়াছে। এক কথায় একটি মদিরা-প্রবাহের মতোই লখী আজ দামোদরের পথ ধরিয়া মকর-স্নান করিতে চলিয়াছে। নফরা ত তাহার সঙ্গে আছেই; উপরন্তু তাহাদের সহিত পাড়ার আরও দুইচারি জন নরনারী দল পাকাইয়া চলিয়াছে!...

উহারা চলিয়াছিল মাঠের মাঝে সরু আলপথ ধরিয়া এবং উহাদের তিন চারি শত গজ তফাতে 'সরাণ' রাস্তা

ধরিয়া চলিয়াছিল গ্রামের ভদ্র পাড়ার—মহেশ্বরী অপেরা পার্টির তরুণ সভ্যবৃন্দ। তাহাদের মধ্যে গ্রামের জমিদার-বংশীয় দুই তিন জন, দুই একটি ম্যাট্রিক পাশ-করা,—জন চার পাঁচ গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়া,—দুই তিন জন বা গাঁজা, চরস প্রভৃতিতে সিদ্ধ-পক্ব; আবার কেহ কেহ দারুণ ডান-পিটে-ও আছে। সব রকম না মিলিলে ত আর যাত্রার দল হয় না!

তাহারা চলিয়াছে কেহ গজল গাহিতে গাহিতে,—কেহ 'প্রবীরের' বক্তৃতা করিতে করিতে—কেহ কেহ বা গাঁয়ের কোন কোন সুন্দরী কিশোরী বা তরুণীকে লইয়া নানারূপ মুখরোচক আলোচনা করিতে করিতে। বলা বাহুল্য যে, তাহারাও চলিয়াছে পৌষ-সংক্রান্তির দিন দামোদরে মকর-স্নান করিবার জন্য।...উভয় দলের মধ্যবর্ত্তী জায়গায় কয়েকটা অড়হরের ক্ষেত। অড়হরগাছগুলি বড় হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের আড়ালে পড়িয়া কোন দলের কেহ কাহাকেও দেখিতে পায় নাই। কিন্তু খানিকটা অগ্রসর হইবার পর একটা রাস্তার চৌমাথায় আসিয়া যখন দুই দল খুবই কাছাকাছি হইয়া গেল,—তখন হঠাৎ জমিদার-বংশীয় শশিভূষণের দৃষ্টি পতিত হইল লখীর উপর। শশিভূষণ পার্শ্বচরগণকে চকিত করিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—ওরে, দেখ্ দেখ্, ও-মেয়েটা ময়্‌শা বাউরীর মেয়ে লখী নয়? যেটা স্বামী ছেড়ে এসে প্রথম প্রথম নফরার সঙ্গে কিছুদিন খুব মাতামাতি ক'রে এখন ওকে সাঙ্গা ক'রেছে?

পার্শ্বচর যতীন বলিল,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ ছুঁড়িই ত বটে!

"ইস্,—ছুঁড়ির ঠাট্ দেখ্ছিস!"—শশিভূষণ যেন একটা ভারী চমৎকার চাট্নী জিভে দিয়াছে,—চোখে-মুখে এইরূপ ভাব ফুটাইয়াই বলিল,—"সহুরে মেয়েদের মতন করে কাপড়-জামা প'রে ঠমকে ঠমকে চলেছে! ছুঁড়ী এত সব শিখলে কোথায় রে?"

বিড়ির মধ্যেই গাঁজা পূরিয়া তাহাতে দুই চারি টান দিয়া শ্যামধন তখন ডাঙ্গার উপরই অবগাহন-পূর্ব্বক মকরস্নান করিতেছিল!—মাথাটা প্রবলভাবে নাড়িয়া—ঢুলুঢুলু চোখ দুইটি ঘুরাইয়া সে উত্তর দিল,—'শিখ্বার আর ভাবনা কি বল্? আমাদের 'মোদোর' বোন্ই ত ঐ রকম ক'রে কাপড় পরে। আর তোর মাস্তুত ভাইএর বৌ-ইত এ বছর পূজোর সময় ঐ রকম ফ্যাচাং দিয়ে কাপড় প'রে, তোদের বাড়ী এসেছিল! ঐ রকম করে সাজ-গোজ ক'রে, আর অসার ফুটানী মেরে আজকালকার মেয়েগুলো মনে করে কি হ'য়ে গেছি! দেখে শুনে আমার এমন ঘৃণাই লাগে! ভদ্রলোকদের দেখেশুনে ওরাও শিখ্ছে।

"কিন্তু লখী ছুঁড়ীকে ভারী মানিয়েছে মাইরী! আমাদের ভদ্র ঘরেও অমনটি মেলে না।"—লখীকে দৃষ্টি দিয়া গ্রাস করিতে করিতেই শশিভূষণ উত্তর করিল,—"ছুঁড়ীকে একদিন আমাদের যাত্রার আখড়া-ঘরে নিয়ে গিয়ে নাচাতে পারিস্?"

'টাকা!'—হরিশ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল,—টাকা খরচ

কর্‌তে পারলে লখী ত লখী ; অমন কত ছুঁড়ীকেই নাচিয়ে দিতে পারা যায়।

পাঁচু চেঁচাইয়া উঠিল,—'একশোবার ! তার আর কথাই নাই।'—পরে স্বর একটু নিম্ন করিয়া—'তা-লখীকে দেখে শশী-ভায়ার মাথা ঘুলিয়ে যাচ্ছে না কি ! আরে ছিঃ, যতই হোক্ বাউরীর মেয়ে !

কামের দৃষ্টি যখন রূপ উপভোগ করে,—তখন সম্বন্ধ থাকে ক্ষুধা এবং ভোগ্যবস্তুর সহিত। আর সকলই তখন বিচার-বিবেচনা ও বিতর্কের বাহিরে চলিয়া যায়। সুতরাং শশিভূষণের মনে তখন বাউরী-ডোমের কোন প্রশ্নই উঠে নাই। সে দেখিতেছিল কামের দৃষ্টি দিয়া লখীর রূপ, এবং সেই রূপ-ভোগের অনুভূতি বিদ্যুৎ প্রবাহিত করিতেছিল,—তাহার প্রতি শিরায়-উপশিরায় ! পাঁচুর কথাটাকে একেবারে তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দিয়া সে বলিল,—'আরে রেখে দাও তোমার ওসব ছেঁদো কথা তুলে ! কত বড় বড় ঘরের ভদ্রলোকের ছেলেরা যে বেশ্যাবাড়ী যাচ্ছে,—সেখানে বুঝি সব বামুনের মেয়েরা বসে আছে ? কত ভদ্র ধনী সখ করে উপপত্নী রাখছে,—তাতে জাত-অজাতের বিচার নাই। আর যত দোষ লখীর বেলায় ! কারণ সে তোমাদের গাঁয়ের বাউরীদের মেয়ে। কিন্তু এই বাউরীর মেয়ে লখীই যদি সহরে গিয়ে বেশ্যাবৃত্তি আরম্ভ করে দেয়,—তখন আর তার জাত-বিচার থাকবে না। তখন কত কুলীন বামুনের ছেলেও তার ঘরে সারারাত কাটিয়ে

এসে দিনের বেলায় স্নান করে শিব-পূজা করতে যাবে। তাতে দোষ হয় না, আর জাতও যায় না !...এ ব্যাপারে আবার ডোম-বাউরীর বিচার কি রে ? যাকে মনে ধরে, সেই শুদ্ধ !

অতবড় যুক্তির বিরুদ্ধে পাঁচুর মুখে সহসা আর কোন কথা ফুটিল না। শশিভূষণের বক্তৃতা তাহাকে যেন একেবারে স্তম্ভিত করিয়া দিল। নফরা ও লখীর দল অবশ্য তখন তাহাদের পাশ কাটাইয়া খানিকটা দূরে গিয়া পড়িয়াছে।...তা পড়ুক,—যাত্রা-পাটির তরুণগণ কিন্তু মসগুল হইয়াই তাহাদের আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইল এবং ক্রমশঃ শুধু লখী নয়,—ফুলী, উষী, হেমী, নীরি প্রভৃতি ডোম ও বাউরীদের অনেক সুন্দরী তরুণীই একে একে তাহাদের আলোচনার আসরে নামিয়া আসিল। "মকর-স্নান" চুলোয় যাক্‌, উপস্থিত তাহারা যে তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতে লাগিল,—তাহার তল কোথায়,—কে জানে ?

তিন চার দিন পরের কথা। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। শশিভূষণ বাউরী-পাড়ার কুলি * ধরিয়া ধীরে ধীরে নফরার দরজায় অসিয়া দাঁড়াইল। তারপর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া,—সঙ্গে সঙ্গে একবার এদিক সেদিক চাহিয়া লইয়া উচ্চকণ্ঠেই ডাকিল,—নফরা—ও নফরা !

নফরা ঘরেই ছিল। একটু আগেই সে কাজ হইতে ফিরিয়াছে। শশিভূষণের ডাকে সে ঘরের ভিতর হইতেই সাড়া দিল,—কে ?

* কুলি—গ্রাম্য পথ।

"ওরে আমি, আমি,"—শশিভূষণ চীৎকার করিয়াই বলিয়া উঠিল,—"ঘটকপাড়ার শশীবাবু। একবার বাইরে আয়, তোর সঙ্গে একটু দরকার আছে।"—মনে মনে সে কিন্তু নফরা ঘরে থাকার জন্য একটু ক্ষুণ্ণই হইল। তবে নফরা যখন ঘরেই রহিয়াছে, তখন তাহাকে ডাকিয়া ত আর ফিরিয়া যাওয়া যায় না? ইত্যবসরে নফরাও সেখানে আসিয়া তরল অন্ধকারে শশিভূষণকে চিনিতে পারিয়াই বলিল,—ও শোশিবাবু, পেন্নাম!—সঙ্গে সঙ্গে সে হাত দুইটা কপালে ঠেকাইল,—"তা কি হুকুম বাবু?"

শশী প্রশ্ন করিল,—তুই এখন কোথায় কাজ করছিস রে?"

"এজ্ঞে, এখনও ত ধান কাটার কাজ কিছু কিছু বাকী রইছে। যন্ দিন যে ডাকছে,—তার কাজেই যেছি।"

"তা আমাদের ধান পিটোতে লেগে যা না এইবার।—" কাজের কথাটা মনে মনে গড়িয়া লইয়াই শশিভূষণ জবাব দিল, 'কালু অনেক দিনের পুরনো চাকর, তাই ওকে জবাব দিই না। কিন্তু একা ও আর পেরে উঠছে না। অথচ ধানগুলো শীগ্গির পিটিয়ে ফেলা দরকার। দ্যাখ, যদি তোর সুবিধে হয়।"

নফরা জবাব দিল,—"এজ্ঞে, আরও তিন চারটে দিন না গেলে আপনকারদের কাজে লাগতে লার্ছি; মাপ কর।"

"তা তিন চার দিন পরেও লাগতে পার্বি ত?',—শশিভূষণ অবশ্য অযথাই প্রশ্ন করিল।

নফরা বলিল,—হঁ-হঁ, তা লিশ্চোই পারব।

"বেশ।"—শশিভূষণ আর সেখানে দাঁড়াইল না। নফরাও

ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিল। সে বুঝিল না যে,—ধান পিটাইবার তলে শশিভূষণের কোন্ 'চাল' বিদ্যমান রহিয়াছে! লখী নফরাকে জিজ্ঞাসা করিল,—কে ডাকছিল রে?

"ও-ঘটকদের শোশীবাবু।"

'ঘটকদের শোশীবাবু' যে সেদিন মকর-স্নানের পথে তাহাকে দৃষ্টি দিয়া গিলিতে আরম্ভ করিয়াছিল,—তাহা লখীর দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। তাহার এই আগমনের মধ্যে সেই দৃষ্টিরই জের চলিয়াছে, বুঝিয়া ভ্রূকুটি করিয়াই লখী জিজ্ঞাসা করিল,—"কি বল্‌ছিল কি তুখে?"

"ওই উয়োদের ধান পিটেতে ব'ল্‌ছিল।" নফরা সরলভাবেই উত্তর দিল,—"আমি ব'ল্‌লম, তিন চারদিন বাদে লাগ্‌বো।"

লখী আর কিছু বলিল না। নফরার অজ্ঞাতসারে তাহার মুখে একটু হাসি খেলিয়া গেল।

কিন্তু শশিভূষণ তাহার মনগড়া কথাটা অনেক চেষ্টার পর কার্য্যেই পরিণত করিল। অর্থাৎ তিনচার দিন পরে সে সত্য-সত্যই নফরাকে তাহাদের খামারে ধান পিটাইবার কাজে লাগাইয়া দিল।...

দুপুরবেলা,—নফরা শশিভূষণদের খামারে আঁটির পর আঁটি ধান পিটাইয়া চলিয়াছে,—মুহূর্ত্তও তাহার শ্বাস ফেলিবারও যেন অবকাশ নাই; এমন সময় শশিভূষণ একেবারে নফরার ঘরের চালায় উপস্থিত হইয়া ডাকিল,—লখী!

লখী অবশ্য ঘরেই ছিল। তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিয়া শশিভূষণকে দেখিয়াই অৰ্দ্ধমুক্ত বুকের কাপড়টা ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া—যেন খুব অপ্রতিভ হইয়াছে,—এইভাবেই জিভ্ কাটিয়া বলিল,—ওমা, বাবু যে!—সঙ্গে সঙ্গে একটা ছাগল চামড়ার আসন একটু ভাল জায়গা দেখিয়া বিছাইয়া দিয়া ব'লিল,—বসো বাবু!

একবার বাহিরের দিকে চাহিয়া শশিভূষণ বলিল,—'না, ব'স্‌বো না লখী! তা—তা'—সে যেন কিসের ইতস্ততঃ করিতে লাগিল,—তারপর হঠাৎ বগল হইতে একটা রঙীন শাড়ী—এবং পকেট হইতে দুইটা টাকা বাহির করিয়া একেবারে লখীর গায়েই ফেলিয়া দিয়া বলিল,—তোকে বক্‌সিস্ দিলাম লখী।

শশিভূষণ যে তাহাকে দেখিয়া মজিয়াছে কিম্বা মরিয়াছে,—ইহা বুঝিতে—বলা বাহুল্য, লখীর বাকী ছিল না। সে মনে মনে একটু হাসিয়া বলিল,—আমাকে কিস্‌কে বকসিস্ দিছ বাবু!

ঢোক গিলিয়া শশিভূষণ উত্তর দিল,—এই দিলুম, দিলুম তোকে আমার খুব ভাল লাগে ব'লে। কই, তোদের পাড়ার আর কাউকে ত কিছু দিতে যাইনি। তা—বুঝলি,—লখী—" বলিয়া সে আবার একটা ঢোক গিলিল।

একে শশিভূষণ গ্রামের জমিদার-বংশের ছেলে,—তায় বয়সটা তাহার এই বাইশ কি তেইশ,—তার উপর আবার চেহারাটাও—তরুণী-মন ভুলাইবার পক্ষে অনেকটা অনুকূল;

তাহার উপর শহরে-বাজারে কখনও কখনও গিয়া সে চাল-চলন ও কেতাদুরস্ত ফ্যাসানও শিখিয়া আসিয়াছে। সাজ-গোজের দিক দিয়াও অবিরত সে বাবু—একেবারে দস্তুরমত ফিট্‌ফাট্‌। সুতরাং আড়চোখে তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া লখীরও ভাল লাগিতেছে বেশ!—এবং সেই ভাল লাগার মধ্যে তাহার বুকের মধ্যেও কিসের একটা শিহরণ খেলিয়া যাইতেছে! শশিভূষণের জামা-কাপড়ের উগ্র এসেন্সের গন্ধও লখীর চিত্তে যেন একটা মদিরা ঢালিয়া দিতেছে! কিন্তু তবুও সহজে ধরা দিবার মতলব লখীর নয়।

সে কৃত্রিম বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিল,—না, না, বাবু, উ-সব কথা ভাল নয়। লোকে পাঁচ কথা ব'ল্‌বেক। নফরা শুন্‌লে রাগ ক'রবেক। তুমি ই সব ঘুরে নিয়ে যাও।" বলিয়া সে শাড়ী ও টাকা দুইটি শশিভূষণের সম্মুখ-দিকে সরাইয়া দিল।

শশিভূষণ ভারী দমিয়া গেল। এদিকে তাহার দেহের প্রতি ধমনীতে তখন রক্ত নাচিয়া উঠিতেছে! এক একবার তাহার মনে হইতেছে,—সেই দণ্ডেই লখীকে টানিয়া বুকের মাঝে জড়াইয়া ধরিবে।...কিন্তু দিনের বেলা,—ঘরের মধ্যে হঠাৎ যদি কেহ আসিয়াই পড়ে?...সে অধীরভাবে পকেট হইতে আরও দুইটা টাকা বাহির করিয়া—দিক্‌-বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়াই লখীর হাত ধরিয়া ফেলিল, এবং উত্তেজনা-কম্পিত স্বরে বলিল,—এই আরও দু'টাকা দিচ্ছি লখী,—এরপর তুই

যখন যা চাইবি দেব,—দোহাই তোর, আমাকে নিরাশ করিস না।”

ঝক্‌ঝকে চারটে টাকা,—একখানা রঙীন শাড়ী সম্মুখে—তাহার উপর—সুদর্শন তরুণ যুবক ধরিয়াছে হাত—লখীরও সর্ব্বাঙ্গ যেন এলাইয়া পড়িতেছিল ; হাতটা ছাড়াইয়া লইবার কথা ত দূরে,—সারা দেহটাই তখন তাহার শশিভূষণের দেহে মিশাইয়া দিতে ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু তবুও সে বহু কষ্টে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল,—আচ্ছা, আচ্ছা বাবু, তাই হবেক। কিন্তুক দেখো, নফরা বা আর কেউই যেন জানতে না পারে।

‘না, না,’—ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শশিভূষণ বলিল,—‘কেউ জানতে পারবে না। আমি কি তেমনি কাঁচা ছেলে মনে করেছিস?’—পরে একবার সতর্ক চঞ্চল দৃষ্টিতে এদিক সেদিক চাহিয়া লইয়া,—‘তা’—দেখ লখী,—সে একটা ঢোক গিলিল, এবং পর মুহূর্ত্তেই টপ করিয়া আবার লখীর একখানা হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল,—এ সময়টা কেউ কোথাও নেই, বেশ ফাঁকা ;—

সে আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল ;—কিন্তু ঠিক এমনই সময়েই নফরার দরজায় কাহার গলার শব্দ শোনা গেল। অমনি শশিভূষণ লখীর হাত ছাড়িয়া দিয়া বিদ্যুৎবেগে উঠানে নামিয়া সামনের ছোট পাঁচীলটা টপ্‌কাইয়া একেবারে ছুতারদের বাঁশবনে গিয়া হাঁপ ছাড়িল!

সেদিন শশিভূষণের পিতা পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন,—ওরে ও শশী, এ কয়দিন না হয় কাজের চাপ বেশি ছিল, কালু একা পারছিল না বলেই নফরাকে রেখেছিলি; কিন্তু এখন ত আর তেমন চাপ্ নেই,—অনর্থক নগদ পয়সা দিয়ে ওকে রেখে আর কি দরকার? এখন কালু একাই পারবে; না কি বল?

কালু একা হয়ত বরাবরই পারিত,—আর এখন ত পারেই। কিন্তু সে পারিলেও শশিভূষণের উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হয় না! সুতরাং পিতার কথার উত্তরে সংসারের অতি বড় শুভাকাঙ্ক্ষীর ভাব করিয়া সে বলিল,—কাজের চাপত কমে এসেছে, কিন্তু দেখছেন ত মাঝে মাঝে কেমন বৃষ্টি বাদল হচ্ছে! একটা ভারী রকম বাদল-বরষা হয়ে গেলেই লোকসানের আর সীমা-পরিসীমা থাকবে না। কিছু পয়সা বাঁচাতে গিয়ে সম্বৎসরের ধান তখন পালুয়েই পচ্‌বে। কালু বরং নফরাকে নিয়ে যত শীগ্‌গির পারে, কাজ সেরে ফেলুক।

উপযুক্ত পুত্রের এই সদ্‌যুক্তির মধ্যে যে কোন্ রহস্য লুক্কায়িত আছে, যোগেশ ঘটক তাহা ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিলেন না। তাই তিনি পুত্রের কথায় আর কোন ওজর-আপত্তি না করিয়া উপস্থিত নফরাকে কাজে বহালই রাখিলেন। এবং বলা বাহুল্যই যে, নফরাকে এদিকে কাজে বহাল রাখিয়া ওদিকে লখীর সহিত শশিভূষণের গুপ্ত প্রণয়-লীলা বেশ অবাধেই চলিতে লাগিল।

কোন কোন দিন রাত্রি নয়টা-দশটা পর্য্যন্তও নফরাকে শশিভূষণদের খামারে থাকিতে হইত। সে সব দিন শশিভূষণের

অভিসারের যেন আরও বেশী সুবিধা হইয়া যাইত। আবার মজা এই যে, নফরার সাহায্যেই নিজেদের খামারের ধান চুরি করিয়া শশিভূষণ তাহা হইতে মাত্র দুই চারি সের নফরাকে দিয়া—বাকী সমস্তই ঈশ্বর বেনের দোকানে বিক্রয় করিয়া ফেলিত,—এবং বিক্রয়-লব্ধ অর্থেই—লখীর মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করিত। নির্ব্বোধ নফরা বুঝিত না যে, তাহার সাহায্যেই ধান বেচিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া শশিভূষণ তাহারই কোন্ সর্ব্বনাশ করিয়া চলিয়াছে!

কিন্তু সত্য যাহা,—এবং যাহা পাপ,—তাহা একদিন না একদিন আত্মপ্রকাশ করিবেই। কোন আবরণের সাহায্যেই তাহাকে চিরদিন চাপিয়া রাখা যায় না।...

অন্যান্য কোন কোন দিনের মত সেদিনও সন্ধ্যার পর নফরা শশিভূষণদের খামারে ধান পিটাইতেছিল। কিন্তু হঠাৎ সে শরীরটা যেন একটু খারাপ বোধ করিয়া ঘরে চলিয়া আসিল এবং আসিয়াই দেখিল,—ঘরে তালা দেওয়া। লখী ঘরে নাই। নফরা ভাবিল, হয়ত লখী পাড়ার কাহারও ঘরে বেড়াইতে গিয়াছে।...সে পাড়ার দুই চারজনের ঘরে গিয়া লখীর সন্ধান করিল,—কিন্তু লখীকে কোথাও দেখিতে পাওয়া গেল না।

নিকটেই ময়রা-দীঘি, যদি লখী ময়রা দীঘিতে কাপড়-চোপড় কাচিতে গিয়া থাকে, এই ধারণায় নফরা ময়রা-দীঘির পাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সন্ধ্যারাত্রি হইলেও—শীতকাল,—ময়রা-দীঘির চারিদিক,—

নিস্তব্ধ নিঝুম। ধীর বাতাসে তালগাছের বড় বড় পাতাগুলা একটু একটু নড়িতেছে ;—দারুণ নিস্তব্ধতার বুকে পাতা-নড়ার শব্দ অতি সুস্পষ্টভাবেই কানে বাজিতেছে। দুই একটা রাত্রিচর পাখীও কিচির মিচির করিয়া সেই নীরবতাকে যেন দোলাইয়া দিতেছে! ময়রাদীঘির কালো জলে নক্ষত্র-খচিত আকাশের প্রতিবিম্ব পড়িয়া জলের মধ্যে যেন হাজার হাজার মণিমুক্তা হাসিয়া উঠিতেছে!

নফরা উত্তর পাড় দিয়া আসিয়া যেমনি পূর্ব্ব পাড়ের কোণ বাহিয়া ঘাটের দিকে অগ্রসর হইবে, অমনি একই সঙ্গে নড়াচড়ার খস্‌খস্‌ এবং কথা কওয়ার ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ তাহার কানে আসিয়া ঢুকিল। চকিতে উৎকর্ণ হইয়া সে শুনিল,—শব্দ তাহার নিকটের গাছপালার ঝোপের মধ্যে হইতেছে। সে কতক আগ্রহে, কতক বিস্ময়ে কতক বা ভয়ে তাড়াতাড়ি ঝোপের দিকে অগ্রসর হইল—এবং যথাসম্ভব, দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিল,—ঝোপের আড়ালে যেন দুই মনুষ্যমূর্ত্তি—এক-জন আর একজনকে জড়াইয়া রহিয়াছে।

নফরার ট্যাঁকে কয়েকটা বিড়ি আর একটা দেশালাই ছিল। সে অতি নিঃশব্দে দেশালাইটা বাহির করিয়াই একটা কাঠি ফস্‌ করিয়া জ্বালিয়া ফেলিল,—এবং চকিতের সেই ক্ষণিক আলোকে যে দৃশ্য তাহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল,—তাহাতে সে বজ্রাহতের মতোই স্তব্ধ হইয়া গেল! বাউরী-যুবতী লখী তখন নিষ্ঠাচার-গর্ব্বী ব্রাহ্মণ-সন্তান শশিভূষণের বাহুবেষ্টনে

আবদ্ধ! নফরার প্রতি শিরায়-উপশিরায় যেন বিদ্যুৎ ছুটিল। তাহার পায়ের নীচের মাটি সরিয়া যাইতে লাগিল! উঃ, এই সেই লখী,—ফুলীকে তাড়াইয়া যাহাকে সে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে!...নফরা আর স্থির থাকিতে পারিল না। ক্রুদ্ধ শার্দ্দূলের মত লাফ দিয়া ঝোঁপের নিকটবর্ত্তী হইল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই শশিভূষণ লখীকে ছাড়িয়া পলাইয়া ছিল,—আর লখীও ভয়ে তৎক্ষণাৎ পাড় হইতে নামিয়া ডাঙ্গার দিকে ছুটিল! নফরার তখন শারীরিক অসুস্থতা উত্তেজনায় উবিয়া গিয়াছে। লখীর পিছু পিছু সেও ছুটিতে আরম্ভ করিল!

ছুটিহে ছুটিতে লখী এদিক সেদিক ঘুরিয়া একেবারে তাহাদের নিজের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতেই যথাসম্ভব উচ্চকণ্ঠে ডাকিল,—বাপ হে বাপ, ঝট্ ক'রে উঠ্‌ত; নফরা আমাকে মার্‌তে আস্‌ছে।

ভূষণ কাঁথা মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল,—তাহার একটু নিদ্রাকর্ষণও হইয়াছিল। লখীর চীৎকারে তাহার ঘুম ছুটিয়া গেল। ধড়্‌মড়্ করিয়া উঠিয়া সে বলিল,—কে—কে?

"আমি—আমি লখী।"

'লখী!'—একটু বিস্মিত হইয়াই ভূষণ দেশালাই জ্বালিয়া শিয়রের কাছেই যে টিনের ল্যাম্পটা ছিল,—ধরাইয়া ফেলিল; আরপর ভ্রূকুটি করিয়া বলিল,—লখী, তুই ইখানে হঠাৎ এলি

কি রকম ? নফরা কুথা ? 'দইব টইব' হয় নাই ত কিছু ? উ-কি, তুই হাঁপাছিস্ কেনে ? অঁ্যা—কি হ'লো, কি"

তাহার কথা শেষ না হইতেই নফরাও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে-ও হাঁপাইতেছিল। ব্যাপার দেখিয়া ভূষণের চক্ষু ত চড়কগাছ! সে ভারী চঞ্চল হইয়া উঠিল, বুঝিল,—একটা গুরুতর রকমেরই কিছু হইয়াছে।

নফরাকে দেখিয়াই লখী তখন ঘরের কোণের দিকে সরিয়া পড়িয়াছে। নফরা তাহার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "বাপের কাছকে এলেই বুঝি ছেড়ে দিব তুখে ? আজ তুরই এক দিক্, কি আমারই একদিক্।" বলিয়াই সে সরোষে লখীর দিকে অগ্রসর হইল।

ভূষণ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল,—আঃ, আগে কি হ'ল তাই বল্! তা'পর অত রোখ করবি।

"রোখ্ করছি কি আর সাধে ?" নফরা উত্তর দিল,—"বুঝ্লি হে শ্বশুর,—তুর বিটি আমাব চোখে ধূলো দিয়ে বামুনদের ছেলার সাথে পীরিত করছে। আজ ময়রাপোখরের তালবনে দুজনকেই আমি ধ'রে ফেলেছি। ঐ যগা ঘটকের বেটা শোশে,—শালা ত ভয়ে কুন্ দিকে ছুটে পালালো, আর তুর বিটিকে আমি তেড়ে নিয়ে আস্ছি। শুন্লি তুর বিটির গুণ! এখন উয়োকে গলা টিপে মার্তে হয় কি—না হয়, তুই-ই বল্।

কথাগুলা শুনিতে শুনিতে ভূষণেরও রক্ত গরম হইয়া

উঠিল। লখীর মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—"নফরা যা' ব'ল্‌ছে সত্যি, লখী ?

লখী অম্লানবদনে অস্বীকার করিল,—এবং বলিল,—উয়োর কথা তুই শুন্‌ছিস কেনে ? উ-ই আমাকে বামুনদের ছেলার কাছকে যেতে বলেছিল, তাথে আমি রাজী না হতে উ আমাকে মার্‌তে আসে, আমি ছুটে পালায়ে এসেছি।

কথা শুনিয়া নফরা যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িয়া গেল।...অ্যাঁ, এত বড় শয়তান এই লখী!...উহার অসাধ্য এ জগতে কি আছে ? নফরার মনে হইল, সেই দণ্ডেই লখীর চুলের মুঠি ধরিয়া তাহার জিভ্‌ টানিয়া বাহির করিয়া দিবে !

ভূষণ তাহার দিকে চাহিয়া সন্দিহানভাবে বলিল,—কি রে নফরা,—ই আবার লখী কি ব'ল্‌ছে ! আমি ত বাবু, তুদের রগড় কিছু বুঝ্‌তে লার্‌ছি।

ক্রোধের আধিক্যে নফরার মুখেও তখন আর কথা ফুটিতেছে না ! অনেক কষ্টে কণ্ঠে স্বর আনিয়া মাত্রাজ্ঞান শূন্য হইয়াই সে বলিল,—তুর বিটি সবই কর্‌তে পারে হে, সবই কর্‌তে পারে। ইয়ের পর উ তুরই নামে একদিন বদ্‌নাম দিয়ে দিবেক, ব'ল্‌বেক, বাপ আমাকে বে-ইজ্জৎ কর্‌তে এসেছিল !

"ধ্যেৎ !"—ভূষণ ধমক দিয়া উঠিল—"কি যা' তা বল্‌ছিস্‌ তুই নফরা। আজ তুই বেশী ক'রে মদ খেয়েছিস্‌ বুঝি !

নফরার একবার মনে হইল, বাপ-বেটি দুইজনকেই উত্তম-মধ্যম ঘা কতক করিয়া লাগাইয়া দিবে। কিন্তু সে বহু কষ্টে

আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল,—হক্ কথাই বলছি, বুঝ্‌লি হক্ কথাই ব'ল্‌ছি। তুই একবার সর্ দেখি,—উয়োর গুষ্ঠির আমি 'চান্দ' করি। দেখি, উয়োর কুন্ বাবা এসে হাত আড়' দেয়!

বলিয়াই সে আবার রুষিয়া লখীর দিকে অগ্রসর হইল।

ভূষণ আবার তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "যা, যা, আর রেতের বেলায় আমাকে জ্বালাতন করিস্ না। কাল বিহানে * যা' হয় তাই হবেক। এখন তুই সত্যি বল্‌ছিস্, না, উ সত্যি ব'ল্‌ছে তা আমি কি ক'রে জান্‌বো। এখন যা, কাল ভাল ক'রে সব শুনে, তবে ইয়ের বিচের ক'র্‌বো।

নফরার শরীর এবার এলাইয়া পড়িতেছিল। সে আর দাঁড়াইয়া ঝগড়া করিতে পারিল না। বলিল,—রাখ্‌ তুর বিটিকে তুরই ঘরে,—আমি আর উয়োকে লিব নাই।—বলিয়াই সে মাতালের মত টলিতে টলিতে স্থান ত্যাগ করিল।

ভূষণ লখীকে আবার শুধাইল,—লখী সত্যি করে বল্,—তুর কথা ঠিক্, না নফরা যা' ব'ল্‌ছে, তাই ঠিক্।

পূর্ব্বের মতই লখী জবাব দিল,—ওই খাল্‌ভরাই আমার নামে যা তা লাগাছে, উয়োর কথা মতন কাজ করি নাই বলে।

ভূষণ গম্ভীর হইয়া কি যেন চিন্তা করিতে লাগিল।

* * * *

দুই তিন দিন পরের কথা।

কিছুক্ষণ হইল,—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

* বিহানে—সকালে।

ধীরে ধীরে নফরা মহেশ বাউরীর ঘরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। এই তিন চারিদিনের মধ্যেই তাহার চেহারার অনেকখানি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সহসা তাহার দিকে চাহিলে যেন একটু চমকাইয়াই উঠিতে হয়! মনের উপর আঘাত সে পাইয়াছে দারুণ,—নিজের কার্য্যের জন্য আজ তাহার হৃদয়ে অনুতাপও জাগিয়াছে প্রবল,—আর মনের সহিত এই কয়দিন ধরিয়া—সে এক দ্বন্দ্বও করিয়া চলিয়াছে মুহুর্মুহু। সকল মিলিয়া আজকার নফরা যেন আগেকার নফরা হইতে এক সম্পূর্ণ পৃথক মানুষে পরিণত হইয়াছে!

মহেশের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইতে লজ্জায় তাহার যেন মাথা কাটা যাইতেছিল! একপাশে সে এরূপভাবে দাঁড়াইয়াছিল,—যেন তাহাকে কেহই দেখিতে না পায়। দারুণ কুণ্ঠায় এক একবার তাহার মনে হইতেছিল,—ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু তাহার জীবনের শোচনীয় বিপর্য্যয় তাহার প্রাণে আজ এমন একটা আপ্‌শোষের আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল,—যাহাতে সে ফিরিতেও স্বস্তি বোধ করিতেছিল না।

অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া আগু-পিছু করিতে করিতে নফরা হঠাৎ এক সময় একেবারে মহেশ বাউরীর ঘরের চালার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল,—তাহার পর সঙ্কুচিত কণ্ঠেই ডাকিল,—ফুলী!

প্রথমটা সে কোন সাড়াই পাইল না। আবার কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব উচ্চ করিয়া ডাকিল,—ফুলী!

এইবার জবাব দিল.—মহেশ,—"কে ?" সঙ্গে সঙ্গে ভাবিনীও একটু আগাইয়া আসিয়া উঁকি মারিয়া প্রশ্ন করিল,—কে ?

"আমি নফরা !"—নফরা কুণ্ঠিতভাবেই উত্তর করিল।

তাহার নাম শুনিয়াই মহেশ ও ভাবিনীর সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলিয়া গেল ; তাহারা সমস্বরে নিতান্ত অপ্রসন্নকণ্ঠেই বলিয়া উঠিল,—তুর আর ইখানে কি আছে রে নফরা ?

নফরা নির্লজ্জের মতই প্রত্যুত্তর করিল,—ফুলী কুথা ? তার সাথে আমার কথা আছে। একবার—

কথা শেষ না হইতেই ফুলী এক আকস্মিক উত্তেজনায় যেন অধৈর্য্য হইয়াই ঘরের মধ্য হইতে একেবারে নফরার অতি নিকটে আসিয়া পড়িল,—"কেনে, ফুলীর সাথে আর তুর কি দর্‌কার ? তুর লখী থাক্‌তে ফুলী আবার কে—যা, যা, লখীর কাছকেই যা।"—তাহার কণ্ঠে এক অস্বাভাবিক রুক্ষতা ফুটিয়া উঠিল। ফুলী সেখানে আসিয়া পড়ায় মহেশ ও ভাবিনী ঘরের ভিতর দিকে সরিয়া গেল।

বলাবাহুল্য লখীর কাণ্ডকারখানা ইতিমধ্যেই বাউরী-পাড়ার সর্ব্বত্রই প্রচার হইয়া গিয়াছিল। আর তাহা ফুলীদের ঘরেরও কাহারও শুনিতে বাকী ছিল না।

নফরা কিন্তু ফুলীর রুক্ষ কথায় কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ বা উত্তেজিত হইল না। ফুলীর উপর অমানুষিক ব্যবহার করিয়া আজ যখন সে আবার ফুলীর কাছেই ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন ত কটূ

কথা সহিবার কাজই করিয়াছে। কথা শোনানো ত দূরের কথা, ফুলী যদি আজ তাহাকে ঝাঁটা মারিয়াই তাড়াইয়া দেয়; তবুও ত তাহার অন্যায় হয় না? এবং নফরারও কিছু বলবার থাকে না!

সে অপরাধীর মতই মৃদুকণ্ঠে বলিল,—"তুর কাছে ঘুরে আসবার মুখ সত্যিই আমার নাই ফুলী,—তবু আমি তুর কাছে মাপ চাইছি। আমি না বুঝেই তুখে হেলা-ফেলা ক'রে ঐ লচ্ছার ছুঁড়ীকে সাঙ্গা ক'রেছিলম। কিন্তুক আমার চোখ ফুটে গেইছে। এখন তুই আমার ঘরে চল্,—আমি এই কানমলা খেছি,—আর কখ্খ্নো তুর সাথে লাগব নাই।"

বলিতে বলিতে সে সত্যসত্যই দুই হাত দিয়া কষ্কষ্ করিয়া নিজের দুই কান মলিয়া ফেলিল।

"উ সব সাউখুড়ী তুই হুরূতে * মারাগা।"—ফুলী তিক্ত কণ্ঠেই বলিয়া উঠিল,—"আমি আরও তুর কথায় ভুলি? লখী তুর পেরাণ, লখী রূপসী,—লখীর বয়েস কাঁচা,—উ যাই করুক, তুর কি উয়োকে ছাড়লে চলে?"—একটু বিদ্রূপের ভাবও তাহার কথার মধ্যে ঝরিয়া পড়িল।—তারপর যেন অভিমানে একেবারে ফাটিয়া পড়িয়াই বলিল,—"ওরে, আমার সবই মনে আছে। ভুলি নাই কিছু। পেরাণ থাকতে আর ভুলতেও লারবো। আমাকে কাঁদায়ে কাঁদায়ে লখীর সাথে তুর পীরিত, আমার বাড়া-ভাতে ধূলো দিয়ে, লখীকে নিয়ে তুর দিনরাত ফূর্ত্তি,—তার উপর

* হুরূতে—তফাতে, দূরে।

আবার মেরেধরে আমার হাড় কটা ভেঙে দেয়া,—সব আমার মনে আছে ?'—বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ ভারী হইয়া উঠিল !

অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া নফরা বলিল,—"দোহাই তুর ফুলী, আমাকে ইবার তুই বিশ্বেস কর। কেনে, না হয় না বুঝে,—না সুঝে তুর সাথে খারাপ ব্যাভার করেই ফেলেছি ; কিন্তুক তুর কি মনে নাই,—তুখে আমি কত ভালোও বেসেছি ?—সে ভালবাসার কথা কি তুর একেবারেই মনে পড়ছে না !

ফুলীর অন্তর যেন হাহাকার করিয়া উঠিল, ওরে,—সেই সব দিনের কথা মনে আছে বলেই না আজও কাউকে সাঙ্গা করতে পারি নাই। তুর ভালর জন্যে কত ঠাকুর-দেবতার থানে মাথা ঠুকেছি ! কিন্তু তুই কি তার মর্ম্ম বুঝিস ! অন্তর তাহার ঐভাবে গুমরিয়া উঠিলেও মুখে কিন্তু সে অন্যরূপ বলিল ;—বলিল,—তুর গুণে সে সব আর মনে রাখতে দিলি কই ? বোশেখ মাসে আমার সাঙ্গার সবই ঠিক হয়ে গেইছে। আর কেনে জ্বালাতে আসিস ?

কথাটা যেন মুগুরের মতই নফরার বুকে আঘাত করিল। সে প্রায় আর্ত্তনাদ করিয়াই উঠিল,—না, না, তুর পায়ে পড়ি ফুলী, তুই আর সাঙ্গা করতে যাস না, আমি তুর ছামনেই সাত হাত মেপে নাকখৎ দিছি, আর কখখনো তুর সাথে ঝগড়া বিবাদ করবো নাই।' বলিয়া সে যেমন কথার সঙ্গেসঙ্গেই

কান মলিয়া ফেলিয়াছিল, তেমনি নাকখৎ দিবার উদ্দেশ্যে সেই খানের জমি মাপিবার জন্য উদ্যত হইল।

দেখিয়া শুনিয়া ফুলীর প্রাণের ভিতরটা একবার মোচড় দিয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত্তেই সে আপনাকে দৃঢ় ও সংযত করিয়া লইয়া নফরাকে বাধা দিয়া বলিল,—খামকা খামকা কেনে আর অত সব বলছিস। বরং আমার সাঙ্গায় তুখে নেওতন্ করছি.। আসিস্, মদভাত খেয়ে যাস্।"

উঃ, ফুলী এত বড় আঘাতও দিতে পারে? নফরা বিস্ফারিত চক্ষে ফুলীর মুখের দিকে চাহিল। তাহার দৃষ্টির মধ্যে এক সুগভীর কাতরতা ফুটিয়া উঠিল। আলোর জোর না থাকায় নফরার মুখখানা ফুলী ভালরূপ দেখিতে পাইল না। নচেৎ—তাহার সে সময়কার কাতর দৃষ্টির দিকে চাহিলে, ফুলী হয়ত কাঁদিয়াই ফেলিত! কিন্তু আঘাত দিবার জন্যই ত সে ঐ মনগড়া কথা বলিয়াছে। সুতরাং সে নিজেকে তেমনি সংযত করিয়াই রাখিল। বাহিরে বিন্দুমাত্রও চঞ্চলতা প্রকাশ করিল না।

নফরা কোনরূপে নিজকে খানিকটা সাম্‌লাইয়া লইয়া আবার একবার জিজ্ঞাসা করিল,—অবশ্য এবার তাহার স্বর অপেক্ষাকৃত ভারী হইয়া উঠিয়াছিল—তাহালে সত্যিই আমাকে আর লিবি নাই তুই।"

"না, না, আমাকে আবার তুর কি দরকার, তুই লখীর কাছেই যা।" অভিমানের আধিক্যে ফুলী সেই আগেকার কথাই পুনরাবৃত্তি করিল।

নফরা আর কিছু না বলিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে সেখান হইতে রাস্তায় আসিয়া দাড়াইল। তাহার পর অন্ধকারে মিশাইয়া কোথায় গেল,—সেই জানে!

এদিকে বাঁকার দারুণ জ্বর। পাঁচদিন হইল, জ্বরের তাপ ক্রমশঃই বাড়িতেছে; মিতন অনেক কষ্টে একটি টাকা যোগাড় করিয়া গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার ভবেশ বাবুকে ডাকিয়া পুত্রের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছে বটে; কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই।

নিকটবর্ত্তী সহরে অবশ্য পাশকরা ভাল ডাক্তার আছেন। কিন্তু তাঁহাকে আনিতে তো অর্থব্যয় আছে! গরীব লোক মিতন, যাহার আজ বাদে কাল খাইবার সংস্থান নাই; সে অত অর্থ কোথায় পাইবে? পল্লীগ্রামে এমন কত দরিদ্রের ঘরে কত রোগী সুচিকিৎসা অভাবে মারা যায়, তাহা কে নির্ণয় করিবে?

দেখিতে দেখিতে বাঁকার অবস্থা বড়ই গুরুতর হইয়া উঠিল! জ্বরের তাড়নায় সে প্রলাপ বকিতেও সুরু করিল। প্রলাপ বাক্যের মধ্যে ফুলীর নামটা তাহার মুখে বারম্বারই উচ্চারিত হইতে শোনা গেল। মিতন বুঝিল, ফুলীর জন্য অবিরত চিন্তা করিতে করিতেই বাঁকা জ্বরে পড়িয়াছে—অনেকটা মানসিক দুশ্চিন্তা ও ব্যথার জন্য। সুতরাং সে আরো বেশী উদ্বিগ্ন হইয়া ভবেশ ডাক্তারকেই সব কথা খুলিয়া বলিল,—ভবেশ ডাক্তার

মুখের একরূপ অপরূপ ভঙ্গী করিয়া তখনও জবাব দিলেন,—
"ও কিস্-স্যু না, সেরে যাবে।"

হঠাৎ রোগক্লিষ্ট বাঁকা একদিন মিতনকে বলিয়া বসিল,—
বাপহে, একবার ফুলীকে ডেকে আন্‌তে পারিস ?

মিতন বলিল,—এখন আর "ফুলীফুলী" করিস্ না বাবা,
বাজ্‌বন্দা * দে। ভাল হ'য়ে উঠ্; আমি যেমন ক'রেই
হোক্, ফুলীর সাথে তুর সাঙ্গা দিব।

বাঁকা জবাব দিল,—'না, না, উয়োকে এইখানে একবার
ডেকে আন্‌তে হবেক। তার সাথে আমার কথা আছে।' সে
ভীষণ জেদ্ ধরিল। কিছুতেই মানিতে চাহিল না।

অগত্যা মিতন নিজে এক সময় মহেশ বাউরীর বাড়ী গিয়া
অনেক বলিয়া কহিয়া ফুলীকে বাঁকার নিকট লইয়া আসিল।
বাঁকা জ্বরের ঘোরে চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিল। মিতন উচ্চকণ্ঠে
ডাকিল,—বাঁকা, এই দেখ, ফুলী এসেছে, কি বলবি বল্ উয়োকে।

ফুলীর নামটা কানে ঢুকিতেই বাঁকা চকিতে চোখ মেলিল ;
তাহার পর ইঙ্গিতে তাহাকে শিয়রে বসিতে বলিল।

বাঁকাকে দেখিয়াই ফুলী বুঝিতে পারিল,—তাহার অবস্থা
খারাপ। সুতরাং তাহার মন একটু করুণ ও আর্দ্র হইয়াই
উঠিল এবং কোনরূপ ওজর-আপত্তি না করিয়া বাঁকার কথামত
সে তাহার শিয়রে বসিল। বাঁকা একটু কষ্টের সহিতই ধীরে
ধীরে বলিল,—সেই খবরের কাগজে মুড়া—

* বাজবন্দা—ক্ষান্ত, রেহাই।

তাহার মতলব বুঝিতে মিতনের বিলম্ব হইল না। ফুলীকে উপহার দিবার জন্য বাঁকা ইছাপুরেরে হাট হইতে যে জিনিষ-গুলি আনিয়াছিল,—সেগুলি সে যত্ন করিয়া দুই তিন খানা খবরের কাগজ জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল; মিতন তাহা জানিত। যন্ত্র-চালিতের মতই মিতন সেই মোড়কটি লইয়া আসিয়া বাঁকার ডান পাশে নামাইয়া দিয়া একটু তফাতে সরিয়া গেল।

ফুলী তখন যেন একটা রহস্যের মধ্যেই পড়িয়া গিয়াছিল,—তাইত, বাঁকা কি করিতে চায়? অথচ বাঁকার শরীরের অবস্থা দেখিয়া সে মুখে কিছু বলিতে পারিল না।

বাঁকা উপহার-দ্রব্যের বাণ্ডিলটি কম্পিত হস্তে অনেক কষ্টে ফুলীর পায়ের কাছে রাখিয়া—ক্ষীণকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল,—ফুলী, দেখছিস ত, আমার আর বাঁচবের আশা-ভরসা নাই,—কিন্তুক, এই মর্‌তে মর্‌তে সত্যিই বলছি,—তুখে আমি মনে মনে খুবই ভালবাসতম। তুর জন্যে এইগুলি এনেছিলম,—তুই লিস্‌ নাই;—আমাকে সাঙ্গা কর্‌বি নাই বলে। তা—আমাকে সাঙ্গা করিস নাই, ভালই ক'রেছিস্‌। কিন্তুক, এই জিনিষ গুলি তুই যদি না লিস,—আমি বড় দুখেই মরবো। তুর জন্যে এনেছি, তুই লে,—তাহালেও আমি সুখে মরতে পারবো।

বলিতে বলিতে তাহার চোখের কোণে জলও ঝরিয়া পড়িল। যে বাঁকার প্রেম ফুলী ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, আজ সেই বাঁকা মুমূর্ষু! কিন্তু ফুলীকে যে সে কিরূপ প্রাণের সহিত ভালবাসিয়াছিল,—তাহার প্রমাণ পাইতে ফুলীর আজ আর

বাকী থাকিল না। বাঁকার জন্য তাহার অন্তরের কোথায় আজ একটা ব্যথার কাঁটাও খচ্ খচ্ করিয়া উঠিল। বাঁকাকে সে ভালবাসিতে না পারুক,—কিন্তু বাঁকার এই প্রেম উপেক্ষার নহে। আজ আর সে বাঁকার কথায় বিরক্ত হইতে পারিল না। বরংচ তাহার অন্তরে একটি সকরুণ কোমল ভাবই জাগিয়া উঠিল,—আহা, এই জিনিষগুলি উপহার-স্বরূপ লইলেই বাঁকা যদি শান্তিতে মরিতে পায়,—তবে এসময় বাঁকার মনে আঘাত দেওয়া কখনই তাহার কর্ত্তব্য নহে।

নিজের মনের সহিত এইভাবে বোঝা-পড়া করিয়া ফুলী বলিল,—তুর জিনিষগুলি আমি নিলম রে বাঁকা,—ইগুলি আমি পরবো। কিন্তুক তুই মর্‌বো মর্‌বো করছিস কেনে? দেখবি বেঁচে উঠবি!

বাঁকার মুখে একটা উজ্জ্বলতা এবং অধরে একটু ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল,—আমি বুঝতে পারছি ফুলী, আমি আর বাঁচ্‌বো নাই। কিন্তুক, মরবের আগে তুই যে একবার এলি,—আমার জিনিষগুলি নিলি,—ইয়েতেই আমার ভারী আরাম লাগছে। ভগমান, তুর ভাল করুক।

ফুলীর নাক দিয়া সহসা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল; সে আরো কিছুক্ষণের জন্য বাঁকার শিয়রেই বসিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।...

ইহাই জগতের সনাতন নিয়ম।...মানুষ ভাবে এক, হয়

অন্যরূপ। পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে মানুষ যাহার কল্পনাও করে নাই,—পর মুহূর্ত্তেই তাহা সংঘটিত হইতে দেখা যায়। আশা-ভরসাময় মানব-জীবনের সমস্তই সেই অচিন্ত্য ও অলক্ষ্য শক্তির একটি কটাক্ষেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়! মানুষ আশ্চর্য্য হইয়া ভাবে,—একি হইল? ইহারই নাম বুঝিবা মোহ,—ইহারই নাম বুঝিবা মায়া!

যে বাঁকা সুস্থদেহ, বলিষ্ঠ ও নীরোগ যুবক, জীবন-পথে মনোমত সাথী পাইবার জন্য এই দুইদিন পূর্ব্বেও যাহার ব্যাকুলতা ও আগ্রহের অন্ত ছিল না! কত আশা, আকাঙ্ক্ষা ও রঙীন কল্পনা যাহার হৃদয়ে ভবিষ্যৎ সুখের মোহে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উত্থিত করিতেছিল, সেই বাঁকার জীবনদীপও কার একটি ফুৎকারেই চিরতরে নিভিয়া গেল!

ফুলী বাঁকাকে ভালবাসিতে পারে নাই, কিন্তু বাঁকার মৃত্যু-সংবাদ যখন তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল; তখন কিসের যেন একটা আকস্মিক ব্যথার আঘাতে সে আর নিজকে সামলাইতে পারিল না। তাহার দুই চোখ দিয়া অজস্র জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বাঁকার জীবনের অনেক ঘটনাই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। বিশেষতঃ বাঁকা যেদিন ময়রা-দীঘির ঘাটে ফুলীর নিকট প্রেম নিবেদন করিতে গিয়াছিল,—যেদিন ইছাপুরের হাট হইতে তাহার জন্য নানা উপহার কিনিয়া আনিয়াছিল, সর্ব্বতোপরি যেদিন প্রত্যাখ্যাত উপহারগুলি সে পুনরায় গ্রহণ করায় মুমূর্ষু বাঁকার চোখেমুখে একটা দীপ্তি ফুটিয়া

উঠিয়াছিল ;—সেই সব দিনের কথা বড় সুস্পষ্ট ভাবেই ফুলীর আজ মনে পড়িতে লাগিল। একবার তাহার মনে হইল,—তবে কি তাহার প্রত্যাখ্যান বাঁকার বুকে বড় গুরুতরভাবেই বাজিল, আর বাঁকা তাহা সামলাইয়া উঠিতে পারিল না ?—কথাটা ভাবিতে গিয়াই ফুলীর অন্তর যেন ভাঙিয়া পড়িতে চাহিল। সহসা সে অধৈর্য্যভাবে উঠিয়া বাঁকার দেওয়া জিনিষগুলি খুলিয়া এক-একটি করিয়া বার-বার নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। জিনিষ গুলি যতই তুচ্ছ হোক,—আজ সেগুলি দেখিতে দেখিতে ফুলীর মনে হইল, একজন প্রকৃত প্রেমিকের ভালবাসার দরদ তাহাদের অণু-পরমাণুতে মিশিয়া আছে,—এবং সেই দরদ যেন এই নিতান্ত তুচ্ছ জিনিষগুলাকে আজ এক মহামূল্য দান করিয়াছে !

* * *

ফুলীর নিকট হইতে প্রত্যাখ্যিত হইয়া নফরা যে পথ ধরিয়াছে,—তাহাকে ধ্বংসেরই পথ বলা যাইতে পারে। লখী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহার হৃদয়ে দাবানল জ্বালিয়া দিয়াছে ; সেই আগুন নিভাইবার আশায় নফরা ছুটিয়াছিল,—ফুলীর নিকট ক্ষমা চাহিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে। কিন্তু ফুলীও যখন প্রচণ্ড অভিমানে তাহাকে নিষ্ঠুর আঘাত দিয়া ফিরাইয়া দিল,—তখন নফরার মনের আগুন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। দহনের তীব্র জ্বালা ভুলিবার জন্য সে নেশায় যেন ডুবিয়া গেল !

মদ অবশ্য সে বরাবরই খাইত, কিন্তু তাহার একটা নিয়ম

ছিল,—এখন তাহার মন যখনই অশান্ত হইত,—তখনই সে ঢক্ ঢক্ করিয়া খানিকটা মদ খাইয়া ফেলিত। আবার যখন মদ না পাইত,—তখন সে গাঁজা-চরস প্রভৃতির আশ্রয় লইত। মোট কথা, প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই সে নেশার ঝোঁকে থাকিয়া মনের জ্বালা ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিত।

ফলে তাহার শরীরও দিনের পর দিন ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। পাড়ার অনেকেই বলাবলি করিতে লাগিল,—নফরাটা বুঝি আর বাঁচবেক নাই। যে রকম মতিগতি হয়েছে—তাতে বোধ হয়,—আর উয়োর বাঁচবেরও সাধ নাই! আহা, ছোঁড়াটা পাঁচ রকমে মাটি হয়ে গেল! কবে হয়ত একলা ঘরে নেশার চোটেই মরে পড়ে থাকবেক!

কথাগুলা কিছু কিছু ফুলীর কানেও আসিতে লাগিল। বাঁকার মৃত্যুর মূলে,—তাহার প্রত্যাখ্যানজনিত একটা আঘাত যে আছে,—ইহা ফুলীর দৃঢ় ধারণা হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং নফরার সম্বন্ধে আলোচনাগুলি ফুলীকে বিচলিত না করিয়া পারিল না। সে এখন বুঝিতে পারিল,—লখীর বিশ্বাসঘাতকতার উপর তাহার প্রত্যাখ্যান—এত গুরুতর হইয়াই নফরার বুকে বাজিয়াছে যে,—জীবনের উপরও তাহার আর কোন স্পৃহা নাই।

ফুলীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল! না, না, বাঁকার মৃত্যু তবু তাহার সহিয়াছে,—কিন্তু নফরার? না, নফরার বিচ্ছেদ সে প্রাণ থাকিতে সহিতে পারিবে না!

সে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল! কিন্তু অভিমানও সে ত্যাগ করিতে পারিল না। চাঞ্চল্যের মধ্যেই তাহার প্রচণ্ড অভিমান যেন মাথা চাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল,—কিন্তু নফরার অত বড় দুর্ব্ব্যবহার কি এতই সহজে ভুলিয়া যাওয়া যায়?

কিন্তু দুই তিন দিন পরে বেনের দোকানে সওদা করিতে যাইবার সময় ফুলী যেদিন রাস্তা হইতে খানিকটা দূরে, একটা অশথ গাছের তলায় বসিয়া নফরাকে ঝুমিতে দেখিল,—তখন অনুতাপের প্রাবল্যে তাহার অভিমান যেন কোথায় ভাসিয়া গেল। নফরার দিকে বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া সে ভাবিল,—অ্যাঁ, এ—নফরা,—না তাহার কঙ্কাল! এই কঙ্কালের উপর এখনও সে অভিমান করিয়া চলিয়াছে! ভাবিতে ভাবিতে তাহার চোখ দিয়া খানিকটা জল গড়াইয়া পড়িল!

বেলা তখন প্রায় পাঁচটা,—একটা ছেঁড়া তালপাতার চাটাইয়ের উপর দেওয়াল ঠেস দিয়া বসিয়া নফরা কলিকায় গাঁজা ভরিতেছিল। একটা সদ্য-শূন্য মদের ভাঁড় তাহার অদূরে পড়িয়া আছে। গাঁজাও সে ইতিপূর্ব্বে দুই কলিকা ধ্বংস করিয়াছে; এইবার তৃতীয় ছিলেমের পালা।

তাহার পাঁজরগুলি একটি একটি করিয়াই এখন গোনা যায়। কোটরগত চক্ষু দুইটি জবাফুলের মতই লাল। মুখের হাড়গুলি উঁচু হইয়া উঠিয়াছে!

হঠাৎ নফরার কি খেয়াল হইল, গাঁজার কলিকাটা নামাইয়া

রাখিয়া, মদের ভাঁড়টা লইয়া ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

একটু পরেই ফুলী নফরার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘর-খোলা, অথচ কেউ কোথাও নাই। আজ ঘর-দুয়ারের অবস্থা দেখিয়া ফুলীর যেন কান্না পাইতে লাগিল। কুঁড়ে ঘর, অবশ্য কুঁড়ে ঘরই আছে; কিন্তু পূর্ব্বে সেখানে যে শ্রীটুকু ছিল, আজ আর তাহা নাই।

ঘরে ঢুকিয়া চাটাইয়ের কাছে গাঁজা-ভরা কলিকাটা পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া ফুলী ভাবিল,—নফরা ঘরের আশে-পাশে কোথাও আছে। কিন্তু প্রায় পনের মিনিটের মধ্যেও যখন নফরার ঘরে থাকার কোন চিহ্ন দেখা গেলো না,—তখন ফুলী আপন মনে কি যেন বলিতে বলিতে—ধীরে ধীরে রাস্তায় আসিয়া নামিল।

রাস্তায় নামিতেই পাড়ার নীরির সহিত তাহার দেখা হইল। নারি মদের দোকানে গিয়াছিল, তাহার হাতে মদ্যপূর্ণ একটা ভাঁড় রহিয়াছে। ফুলীকে দেখিতেই নীরি ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল,—এই যে ফুলী,—তুদের ঘরই যেছিলম। যাবি ত যা, দেখগা, নফরা মদশালে অচেঠা হ'য়ে পড়ে গেইছে। কিছুতেই চেঠা * ফিরছে নাই।

ফুলীর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইয়া গেল! সে আর তিলমাত্র দেরী না করিয়া সেই মুখেই পচুই মদের দোকানে ছুটিল।

* চেঠা—চৈতন্য, জ্ঞান।

ছুটিতে ছুটিতেই বলিয়া গেল,—আমার বাপকে যেয়ে খবর দিস্, নীরি!

মদশালে পৌঁছিয়া ফুলী দেখিল, অনেকেই নফরাকে ঘিরিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছে। ফুলীকে দেখিয়াই সকলে একটু সরিয়া গেল। ফুলী সেখানে বসিয়া পড়িয়া নফরার মাথাটা কোলে তুলিয়া আকুলকণ্ঠে ডাকিল,—নফরা, নফরা!

নফরা অতি কষ্টে চোখ মেলিয়া একবার ফুলীর দিকে চাহিল। কিছু বলিবার জন্য তাহার ঠোঁট্ দুইটাও যেন নড়িয়া উঠিল। কিন্তু সে কিছুই বলিতে পারিল না। সঙ্গে সঙ্গে তাহার চক্ষু দুইটীও স্থির হইয়া গেল!

ফুলী নফরার বুকে লুটাইয়া পড়িয়া হাহাকার করিয়া উঠিল,—নফরা! নফরা!

সমাপ্ত